অবশেষে

সমরেশ বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৯ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯।

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

সরস্বতী তখন গা থেকে শাড়ির আঁচল, বিছানার উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। দিয়েছে বলা যায় না, কখন আপনিই এলিয়ে পড়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। তোলবার কথা মনে হয়নি। যা গরম! মাথার ওপরে পূর্ণ বেগে ঘূর্ণায়মান পাখার বাতাস তবু একটু গায়ে লাগছে। বলতে ইচ্ছে করে, হাড় জুড়াচ্ছে। তা ছাড়া, দেখছেই বা কে। বাড়িতে আছেই বা কে। গোটা বাড়ি ফাঁকা—বাড়ি না, ফ্ল্যাট। বাইরের দরজা বন্ধ করা আছে। এ ঘরের দরজাও বন্ধ। জানালার খড়খড়ির পাল্লাগুলো বন্ধ, পর্দা ঢাকা। কেবল মাথার কাছে জানালার কাঁচের শার্সি টেনে, পর্দা তুলে দিতে হয়েছে। একটু আলোর দরকার। কারণ সরস্বতীর হাতে একটি উত্তেজিত জারক রসে পূর্ণ ভাণ্ড। দু'হাতে বুকের ওপর ধরা সেটি যেন দেখা যায়। সেই ভাণ্ডটি সে যেন অতি সাবধানে এদিক ওদিক করছে, পাছে এক আধ ফোঁটা রস এপাশে ওপাশে গড়িয়ে উপচে পড়ে। আর পুষ্প? সে মেয়েটাও বাড়ি নেই। দক্ষিণের মেয়ে, ভারতের না, বাঙলার, অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মেয়ে। রীতিমত কাঁচা বয়স, ষোল সতেরো হবে। বিয়ে হয়নি। তা হোক কালো, কালো চোখে বোঁচা নাকে, হাসিটি বেশ মজানো। শরীরও বেশ বাড়-বাড়ন্ত, শাড়ি পরা ধরেছে অনেক দিন। এমন মেয়ে হলো বাড়ির ঝি। বাজার থেকে শুরু করে, যাবতীয় কাজ করে। কিন্তু দুপুরের সব পাট মিটিয়ে, সে মেয়ে একবার বেরিয়ে যাবেই। বলে দিদির বাড়ি যায়। কথাটা সত্যি, দিদি আছে, কাছেই দিদির বাড়িও আছে। এবং পুষ্পর ভগ্নিপতিই এ বাড়িতে পুষ্পকে কাজে লাগিয়েছে। পুষ্পর ভগ্নিপতি সরস্বতীর স্বামীর অফিসে, ক্যান্টিনে বেয়ারার কাজ করে, সেই সুবাদেই পরিচয়। সরস্বতীর স্বামীও শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পুরুষ চাকরের থেকে, মেয়ে ঝি ভালো। বিশেষ করে, সর্বক্ষণের ঝি, বারো মাস বাড়িতে থাকবে এবং সরস্বতী একলা। তা ছাড়া পুষ্প মেয়ে হলেও, দোকান বাজারে পটু, আবার বাসন মাজা, বাটনা বাটা, ঘর গেরস্থালীর কাজেও গোছানো।

অথচ বাড়িতে দুটি পুরুষ। সরস্বতীর স্বামী এবং দেবর। কুটোটি নেড়ে দু'খানি করতে, তাদের গায়ে জ্বর আসে। বাজার দোকানটি পর্যন্ত তাদের দিয়ে হয় না। একজন অফিসে যেতেই হিমসিম খেয়ে যায়, আর একজন এতদিন জুট টেকনোলজি পড়তে যেতেই হাঁপিয়ে পড়ছিল, এখন চাকরি খুঁজতে খুঁজতে অবস্থা একেবারে বে-হাল। অতএব পুষ্পই সব। কিন্তু সরস্বতী বলে রেখেছে, এসব খোয়ারি একদিন কাটবে। এক তো, সরস্বতীর দৃঢ় বিশ্বাস, পুষ্প চতুর মেয়ে, পয়সার এদিক ওদিক করে। আর এই যে প্রতিদিন দুপুর হলেই দিদির বাড়ী যাওয়া, এর একটা ফল আছেই। সেই ফল যদি পুষ্প পেটে ধরে, কোনোদিন তার স্বামী বা দেবরের নামে চালাতে চায়, তা হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কথাটা অবিশ্যি সরস্বতীর নিজের মাথায় আসেনি, পাশের ফ্ল্যাটের এক বর্ষীয়সী অভিজ্ঞ সাবধানী মহিলা ওকে কথাটা বুঝিয়েছেন এবং ও সে-কথা, স্বামী এবং দেবর, দুজনকে একসঙ্গেই সামনাসামনি বলেছে। প্রথমে দু'ভাই কয়েক মুহূর্ত সরস্বতীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। তারপরে নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করেছিল এবং অল্প একটু হাসতে হাসতে, দুজনেই এমন হো হো করে হাসতে আরম্ভ করেছিল, যেন সরস্বতী একটা পাগলী। পাগলীর কথা শুনে, হাসতে হাসতে দুজনের পেট ফেটে যাচ্ছিল। ওদের হাসির মতোই, সরস্বতীর রাগ হয়েছিল, আচ্ছা, দেখা যাবে, এই হাসি কোথায় থাকে। ওই পুষ্প যখন এত বড় একটা ভুঁড়ি নিয়ে, এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকান বাজার করতে যাবে, কোমর নাচিয়ে ফিরে আসবে, তখন এই হাসি থাকলেই বাঁচি।

বলে ঘাড় বাঁকিয়ে সামনে থেকে চলে গিয়েছিল এবং তখনো দু'ভাইয়ের হাসি থামেনি, বরং আরো উচ্চরোলে বেজে উঠেছিল এবং কয়েক সেকেণ্ড পরেই, বড় ভাইয়ের ধমক শোনা গিয়েছিল, এ্যাই ফোঁচা, এ্যাই রাসকেল্, হাসতে তোর লজ্জা করছে না? বৌদির কথা শুনে হাসি হচ্ছে?

ছোট ভাইয়ের হাসি তখনই থেমে গিয়েছিল এবং পাশের ঘর থেকে সরস্বতী তার মিনমিনে গলা শুনতে পেয়েছিল, না, মানে, আমি তো বৌদির কথায় হাসিনি। তোমার হাসি দেখে হেসেছি।

বড় ভাইয়ের ধমক আবার শোনা গিয়েছিল, আমি হেসেছি বেশ করেছি, আমি বৌয়ের কথা শুনে হেসেছি, তা বলে তুইও হাসবি? গুরুজনদের সামনে? যা, চলে যা নিজের ঘরে।

সরস্বতী রাগে ঠোঁট উল্‌টেছিল। তবু যদি না চেনা থাকতো। চোখের সামনে না দেখলেও, কল্পনায় ও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল, দু'ভাই চোখে চোখে ইশারা করছে, ঠোঁট টিপে হাসছে এবং ছোটটা মুখের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে, পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করছে।

এ রকম চলছে দু'বছর। সরস্বতীর আশান্বিত দুর্ঘটনা এখনো ঘটেনি এবং সত্যি বলতে কি, সরস্বতী পুষ্পকে নিয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্তেই আছে, যদিও ও সেটা পুষ্পকে ও স্বামী এবং দেবরকে মোটেই জানতে দেয় না। পুষ্পর ওপরে ও কিছুতেই যেন তুষ্ট হতে পারে না, সব সময়েই প্রায় ধমকে রাখে, তথাপি মেয়েটার মুখের হাসি মুছে যায় না। ধমক, বকুনি সবই যেন হাঁসের গায়ের জলের মতো উপচে পড়ে যায়। আর স্বামী আর দেবর? যতই বকো ধমকাও, রা-টি কাড়বে না। ঠিক যেন গোরুচোর, এমন ভাবে চুপটি করে বসে থাকবে। যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না। কিন্তু সরস্বতী চেনে, দুটি সহোদর ভাই বটে, তবে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। বাইরে থেকে দেখলে, খুবই গোবেচারা ভালো মানুষ, আসলে দুটিতেই, যাকে বলে ফিচেল, তা-ই। ঁ্যাদড়ের জাশুও বলা যায়। এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে ওরা আলোচনা করে না, আর সবকিছুর মধ্যেই যেন ওরা মজা আর হাসির খোরাক খুঁজে পায়। এদিকে একটু সিনেমা থিয়েটার দেখতে যেতে বলো, গায়ে জ্বর আসে। লেকে পার্কে বেড়াতে যেতে বলো, গতরে পোকা ধরে। কিন্তু চা দাও, সিগারেট দাও তাতেই সারাদিন চলে যায়।

পাঁচ বছর সরস্বতীর বিয়ে হয়েছে, এ-ই দেখে আসছে। অথচ

বড় ভাই নীতিশের (ডাক নাম কাঁচু) থেকে ছোট ভাই শীতেশ (ডাক নাম ফোঁচা) কম করে সাত বছরের ছোট। মেলামেশা আচার আচরণ দেখলে মনে হয় যেন দুই বন্ধু। সামনাসামনি সিগারেট পর্যন্ত খায়। উত্তরবঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে, এ দৃশ্য দেখতে হয়নি। সরস্বতী বিয়ের বছরখানেক পরেই, স্বামীর কাছে কলকাতায় চলে এসেছিল। নীতিশ কলকাতার এক সওদাগরি অফিসের ছোটখাটো সাহেব। বিয়ের দু'বছর আগে থাকতেই চাকরি করছিল। সরস্বতী বিয়ের পরে, বি. এ পাস করেছে। শীতেশও ওর সঙ্গেই বি. এস-সি পাস করেছিল এবং দুজনে এক সঙ্গেই নীতিশের কাছে কলকাতায় এসেছিল। নীতিশের পরামর্শেই শীতেশ জুট টেকনোলজিতে ভরতি হয়েছিল। বালিগঞ্জে। নীতিশ যে কোম্পানিতে চাকরি করে, সেই কোম্পানির তিনটি চটকল আছে, ব্যারাকপুর মহকুমা আর শ্রীরামপুর মহকুমা এলাকায়। জুট টেকনোলজির পরামর্শটা সে শীতেশকে দিয়েছিল, অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেই। কয়েক মাস হলো, শীতেশ জুট টেকনোলজি পাস করেছে। জুট টেকনোলজি পাস বলতে এই বোঝায় না, শীতেশ নিয়মিত বালিগঞ্জে গিয়েছে আর এসেছে। ব্যাপারটা অনেক বেশি খটোমটো। বলতে গেলে, আসলে ওকে হাতে-কলমেই কাজ শিখতে হয়েছে এবং প্রায় নিয়মিত বরানগরে চটকলে ওকে যাতায়াত করতে হয়েছে। সেই হিসাবে, ওকে চাকরি খুঁজতে ঠিক বে-হাল হতে হয়নি। বে-হাল হতে হয়েছে, নিয়োগপত্রের অন্তহীন প্রতীক্ষায় এবং এক গভীর দুশ্চিন্তার কারণে, কোথায় কোন্ কারখানায় ওকে নিয়োগ করা হবে।

গত তিন দিন আগেই সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা, একরকমভাবে শেষ হয়েছে। হেড অফিস থেকে আজ শীতেশকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বালিগঞ্জে আর বরানগরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে কয়েক মাস আগেই। সেখানে ওর যোগ্যতা প্রমাণ হয়েছিল, তার কাগজপত্রও ছিল। বাকী ছিল, হেড অফিসের ডাক এবং আর এক প্রস্থ পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটি সব থেকে জটিল ও কুটিল। আগের পরীক্ষাটা ছিল

থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল, খাটুনি প্রচুর। মধ্য কলকাতা থেকে বালিগঞ্জ-বরানগর করাটাই ছিল একটা দুঃসহ, দুঃস্বপ্নের ব্যাপার। তবে সব থেকে বড় সান্ত্বনা যেটা ছিল, একটি চাকরি প্রাপ্তি অবধারিত। কেবল সেই প্রাপ্তির দিনটা কোনো জ্যোতিষের পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল না। এখন হেড অফিস থেকে ডেকে পাঠানোর অর্থ, চাকরি প্রাপ্তির দিন সমাসন্ন। কিন্তু কোথায়? এবং আজ সাহেব পরীক্ষায় কী জিজ্ঞেস করতে পারেন, তা নিয়ে দু'দিন ধরে, দু'ভাইয়ের মধ্যে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে। শীতেশ যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল, তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন ফাঁসী কাঠে ঝুলতে যাচ্ছে। কারণ নীতিশ পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, দ্যাখ্ ফোঁচা, হেড অফিসের সাহেব যদি তোর জবাবে সন্তুষ্ট হয়, তা হলে সব ঠিক আছে। তা না হলে, আর কারোর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে।

যাই হোক, দু'ভাইয়ের এক সঙ্গে সিগারেট খাবার ঘটনাটি, সরস্বতী কোনোদিনই ভুলবে না। উত্তরবঙ্গে থাকতে বা কলকাতায় আসার, বছর দু'য়েকের মধ্যেও, দু'ভাইকে কখনো সামনাসামনি সিগারেট খেতে দ্যাখেনি। সরস্বতী বরং খুশি ছিল, শীতেশ যখন মুখ কাচুমাচু করে, ওকে এসে চুপিচুপি বলতো, বৌদি, দাদার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ম্যানেজ করে দাও। আমার একটাও নেই।

সরস্বতী মনে মনে বেশ খুশির সঙ্গেই সেটা ম্যানেজ করলেও, একটু বাঁকা পথে করতেই ভালোবাসতো। সেটা নারী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য কী না, কে জানে! বলতো, না খেলে কী হয়?

শীতেশ বলতো, সে তুমি বুঝবে না বৌদি। পেটের ভাত হজম হয় না।

সরস্বতী বলতো, বাজে কথা। আমি তো খাই না, আমার কী করে হজম হয়?

মেয়েরা ওসব বোঝে না।

আমার বাবা দাদারা তো সিগারেট খান না। তাঁদের কী করে হজম হয়?

শীতেশ হাত জোড় করে বলতো, তোমার বাবা দাদারা সব ভগবান। এখন দয়া করে একটা সিগারেট এনে দাও পায়ে পড়ি।

সরস্বতীর তখন অন্যান্য নালিশগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। বলতো, হুঁ, নিজের বেলায় আঁটিসুটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি। আমি যে সেদিন এত করে বললাম, আমাকে একটু থিয়েটারে নিয়ে চলো, তখন তো কত ভনিতা করেছিলে। এখন একটা সিগারেটের জন্য একেবারে পায়ে পড়াপড়ি?

এত কথা শুনলেই, শীতেশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠতো। আসলে নেশার জন্য অস্থির হয়ে উঠতো। বলতো, কী করব বলো, নেশা ধরে ফেলেছি।

সরস্বতীর প্রশ্ন, এমন নেশা ধরা কেন?

দাদাকে তো একথা বলতে পারো না?

পারি না আবার? মুখ থেকে সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়েছি কত দিন।

শীতেশ তখন হতাশ আর ক্ষুব্ধ হয়ে বলতো, ঘাট মানছি বাবা, তোমাকে আর সিগারেট ম্যানেজ করতে হবে না।

শীতেশের সেই মুখ না দেখলে ও কথা না শুনলে বোধহয়, সরস্বতীর হৃদয় তৃপ্ত হতো না। বলতো, থাক, আর রাগ দেখাতে হবে না। দাঁড়াও, আনছি।

সরস্বতী যখন তারপরে আসতো, তখন সে একাধিক সিগারেট দিয়ে, দেবরের মনস্তুষ্টি করতো। শীতেশকে এইভাবে স্বামীর সিগারেট উপহার দিয়ে, মনে মনে সে তার ক্ষমতা এবং উপকার করার বিষয়ে বেশ খুশি ছিল। কলকাতায় বছর দু'য়েক এ-রকম কাটবার পরেই, সেই ঘটনা ঘটেছিল।

দোতলার এই ফ্ল্যাটে, শীতেশ যে-ঘরে থাকে, সে-ঘর থেকে বেরোতে হলে, সরস্বতীর শোবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। ঘরের সামনে একটি বারান্দা আছে। তখন গরমের সময়। রাত্রিও বেশি হয়নি। প্রায় দশটা হবে। সকলেরই খাওয়া হয়ে গিয়েছে। শীতেশ

ঘরে দরজা বন্ধ করে, সিগারেট খাবার সুখটি ভোগ করছে। কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় কী ঢুকেছিল, একটু ছাদে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই দেখতে পেয়েছিল, দাদা আর বৌদি মাদুর পেতে বসে আছে। দাদা সিগারেট খাচ্ছে। হয়তো কোনো কথাও হচ্ছিল। শীতেশকে বেরোতে দেখে, দুজনেই চুপ করে গিয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় একটু চমকে গিয়ে, শীতেশ আবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। দাদা বৌদিকে ও কোনোদিনই বারান্দায় মাদুর পেতে বসতে দেখেনি। নীতিশ ডাক দিয়েছিল, এই ফোঁচা, এদিকে শোন্।

শীতেশ বেরিয়ে এসেছিল। নীতিশ জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাচ্ছিলি ?

শীতেশ সত্যি কথাই বলেছিল, একটু ছাদে যাবো ভাবাছলাম।

নীতিশ কেবল শীতেশকে না, সরস্বতীকেও চমকে দিয়ে মাদুরের ওপর থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই শীতেশের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলেছিল, আমার কাছে আর ওসব চালাকি করতে হবে না। এ রাত্তিরে এখন আর দোকানে যেতে হবে না, যা, নিয়ে ঘরে চলে যা।

শীতেশের কাছে ব্যাপারটা এমনই অকল্পিত, ঘটনার বাস্তবতা ও যেন হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারছিল না। নীতিশ আবার ধমকের সুরে বলে উঠেছিল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? যা, নিয়ে ঘরে চলে যা।

শীতেশ ওর দাদার এই ঘরে যাবার নির্দেশকে যে কী মনে করেছিল এখনো বুঝে উঠতে পারে না। তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে-ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। দরজাটা বন্ধ করে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছিল। লজ্জায় প্রায় মাটিতে মিশিয়ে যাবার কথা। দাদার অসংকোচ উদারতার কথা তখন বিবেচনা করার ক্ষমতাই ছিল না।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওকে সেইভাবে বিভ্রান্ত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। বৌদির কুপিত ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গিয়েছিল, নিজের

ছোট ভাইকে তুমি সিগারেট খেতে দিলে?

শীতেশ বন্ধ ঘর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল নীতিশের জবাব, আমি না দিলে বুঝি ও আর খেতো না?

সরস্বতী একটুও শান্ত না হয়ে আরো তীব্রস্বরে বলেছিল, ও খাক বা না খাক, তুমি বড় ভাই হয়ে কী বলে ছোট ভাইকে সিগারেট দিলে?

নীতিশ বলেছিল, ও কি আর ছোট আছে নাকি? ওর বয়সী সব ছেলেরাই আজকাল সিগারেট খায়। ওর থেকে অনেক অ-নে-ক ছোট ছেলেরাও সিগারেট খায়।

সরস্বতীর গলা তীব্রতর, তা বলে বড় ভাই হয়ে তুমি দেবে? তোমার লজ্জা করে না?

নীতিশের শান্ত নির্বিকার গলা শোনা গিয়েছিল, এটা তো এমন মহাপাপ না, এতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আমার সামনে ও সিগারেট খেলে, আমার যদি সম্মান না যায় তা হলেই হলো।

সরস্বতীর সেই একই তীব্র উচ্চস্বর, তোমার সম্মান যায় না, কিন্তু লোকের যায়। আমার যায়। কেন তুমি ছোট ভাইকে নিজের সিগারেট খেতে দেবে? ভদ্রলোকেরা কখনো এ কাজ করে না। তুমি ওর গুরুজন না?

নীতিশ বলেছিল, নাহ্, তুমি দেখছি মেজাজটাই মাটি করে দিলে। ও সব ভদ্দরলোক আর গুরুজনদের মাপকাঠি তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না।

তুমি বুঝি ওর গুরুজন নও?

সরস্বতী উত্তেজনার সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল, নিশ্চয়ই! তুমি যখন গুরুজন, ওর দাদা, আমি বৌদি হয়ে নিশ্চয়ই গুরুজন।

নীতিশ যে আসলে সাপের কোমরে আর একটি খোঁচা দিতে যাচ্ছিল, তা আর নিজেরই খেয়াল নেই। উত্তেজনার বশে সরস্বতীর নিজেরও তা মনে ছিল না। অন্ধকার বন্ধ ঘরের মধ্যে, আড়ষ্ট বিব্রত বিস্মিত বিভ্রান্ত একমাত্র শীতেশই বুঝতে পারছিল, কথাবার্তার মোড় কোন্ ঝগড়ার দিকে চলেছে। সরস্বতীর কথা শুনে নীতিশ সঙ্গে সঙ্গে

জবাব দিয়েছিল, গুরুজন হয়ে তুমি যখন ওকে সিগারেট খাওয়াও, তখন কী হয় অ্যাঁ ?

নীতিশের অভিযোগ সরস্বতীর কাছে প্রায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো। সে যে কবে কোন্ এক অজ্ঞাত সময় থেকে, স্বামীর কাছে ধরা পড়ে আছে, নিজেই জানতো না। বরং সে কথাটা তার মনেই আসেনি। প্রায় ফুঁসে উঠে বলেছিল, আমি ?

নীতিশের সারাদিনের দাবদাহের জ্বালাটা জুড়োবার মুখে এই সামান্য বিবাদের আপদে সেও তখন কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও উত্তেজিত। বলেছিল, অস্বীকার করতে চাও বুঝি ? মনে করেছ আমি জানি না, ফোঁচাকে তুমি রেগুলার আমার প্যাকেট থেকে সিগারেট সাপ্লাই করো।

সরস্বতী রাগে উত্তেজনায় এবং ওরকমভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় প্রথমে কথাই বলতে পারছিল না। তারপরে রাগে ফেটে পড়ে বলেছিল, বেশ করেছি দিয়েছি, আরো দেবো। আমি হলাম ওর বৌদি, ও আমারই সমবয়সী, ওর যদি একটা সিগারেটের দরকার হয়, দেবো না কেন ?

নীতিশ বলেছিল, নিশ্চয় দেবে। আমি তো সেই কথাই বলছি।

বলতে বলতেই নীতিশ হেসে উঠেছিল। কিন্তু সরস্বতী এত সহজে ছাড়বার পাত্রী ছিল না ! সে তেমনি ফুঁসে উঠেই বলেছিল, আমি হলাম বৌদি, আমি হলাম মেয়ে, সেটা একটা আলাদা কথা। আমি যা দিতে পারি, তুমি তা দিতে পারো না। বৌদির কাছে যা আবদার চলে, দাদার কাছে তা চলে না। ঠাকুরপোর যখন বিয়ের কথা হবে, তখন ওর কী রকম মেয়ে পছন্দ, সে কথা কি তোমাকে বলবে, না আমাকে ?

নীতিশ বলেছিল, তোমাকেই বলবে।

সরস্বতী নীতিশকে যেন বাগে পেয়ে কাত করে ফেলেছিল, তা হলে আমি গুরুজন হলেও আমার সঙ্গে যা সম্পর্ক, তুমি দাদা হলেও কি তাই হবে ?

তখন নীতিশই বলেছিল, ঘাট মানছি বাবা, তোমার দেবরকে সিগারেট দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছে।

সরস্বতী বলেছিল, নিশ্চয়ই হয়েছে। দাদা হয়ে ভাইকে সিগারেট দেওয়া ? এ তো মহাপাপ।

নীতিশ বলেছিল, আচ্ছা ঠিক আছে, মনে হচ্ছিল এতক্ষণ বাতাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার যেন বাতাস বইছে। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, আরে এ কি, উঠছো কোথায় ?

সরস্বতী বলেছিল, আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি।

আরে বোসো, বোসো।

না, আমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। বাবার কালে যা দেখিনি আজ তুমি তাই দেখালে।

নীতিশ বলেছিল, আবার ওসব কথা কেন টেনে আনছ নিতু, (নীতিশ সরস্বতীর ডাকনামেই আদর করে ডাকে।) যা হবার তা হয়ে গেছে, এটা এমন একটা কিছু গর্হিত ব্যাপার না, তুমি যতটা ভাবছ। এতে করে তুমি কী ভয় পাচ্ছ ? এখন থেকে ফোঁচা আর আমাকে দাদা বলে সম্মান শ্রদ্ধা করবে না ?

সরস্বতী সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। নীতিশ আবার বলেছিল, ওসব কিছুই হবে না। দ্যাখো দাদা ভাই মুখোমুখি দুটো সিগারেট খেলেই তাদের চিরদিনের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। সিগারেট খাওয়া দিয়ে কি আর শ্রদ্ধা ভক্তির যাচাই হয় ? শ্রদ্ধা ভক্তি হলো মনের বিশ্বাসের কথা, অন্তরের কথা। আর সিগারেট দিয়েছি বলে ও যদি মনে করে দাদা ওর ইয়ার হয়ে গেছে, তা হলে কাল থেকেই ওর কান ধরে—।

নীতিশ কথা শেষ করতে পারেনি, সরস্বতী বলে উঠেছিল, কান ধরে ? এত বড় ছেলের গায়ে তুমি হাত দেবে ?

আহা হাত দেবো কেন ? যদি ও আমাকে ভুল বোঝে—।

সরস্বতী আবার বলে উঠেছিল, ঠাকুরপো তোমাকে কখনো ভুল বুঝতে পারে না।

তারপরে আর নীতিশের জবাব দেবার কিছু ছিল না। আসলে সরস্বতী হলো একটি তড়িৎ গতিবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীর মতো মেয়ে। স্বচ্ছ জলের ধারায়, যার অতলের সবটুকুই দেখা যায়, কোনো অস্বচ্ছতা নেই। অত্যন্ত নীতিবাগীশ এবং ধার্মিক বাড়ির মেয়ে। ছেলেবেলা থেকে অনেক কিছুই সে তার রক্তের কণায় রপ্ত করে নিয়েছে, যা সহজে ভাঙবার নয়। কিন্তু সে তথাকথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়ে নয়। বলতে গেলে প্রসন্নময়ী, বুদ্ধিমতী, চরিত্রের মধ্যে একটি স্নেহ ও প্রীতিপ্রবণ কোমলতা আছে, যা না থাকলে সংসার অসুখের আধার হয়ে উঠতে পারে। এসব সত্ত্বেও, সরস্বতীর চরিত্রে কিছুটা গ্রাম্যতাও আছে, যা অনেক সময় কিঞ্চিৎ জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। মফঃস্বল শহরের কলেজে পড়েও, গ্রাম্যতাটুকু সে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যে কারণে, কোনো কোনো সময় তাকে জেদী মনে হয়। নিজের বুদ্ধিকে তখন সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে চায় না। কেউ চাইলে, তাকেও বুঝতে পারে না। এর পিছনে অবিশ্যি, ছেলেবেলা থেকে একটু বেশি আদরে মানুষ হয়ে ওঠার প্রশ্নটাও আছে।

আসলে সেই তড়িৎ গতিবাহিনী সর্পিল স্রোতস্বিনীর মতো, একটি কলকলানো নদী বলাই ভালো। পাহাড়ি নদী যেমন প্রতি পদে পদেই বাঁক নেয়, প্রতিটি দিগন্তে তার কুলুকুলু সুরের প্রতিটি স্বরলিপি যায় বদলিয়ে, সরস্বতীরও সেইরকম। বুদ্ধি থাকলেও, সে যে হৃদয়াবেগে চলে, সেটাই তার প্রমাণ। তা না হলে, নীতিশের বিরুদ্ধেই সে শীতেশকে সমর্থন করতে আরম্ভ করত না।

সরস্বতীর কথা শুনে নীতিশ বলেছিল, সেই আশাতেই তো ওরকম করে সিগারেট দিলাম। তুমি দেখতে পাওনি, ফোঁচা দু-দুবার ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল ?

বন্ধ ঘরের মধ্যে শীতেশ অবাক ও উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সরস্বতী অবাক হয়ে বলেছিল, তাই নাকি ? না তো! কেন ?

নীতিশ হেসে বলেছিল, এটা আর বুঝতে পারলে না ? তুমি আর আমি বারান্দায় বসে গল্প করছি, ওদিকে শ্রীমানের সিগারেট নেই।

তোমাকে পাচ্ছে না যে বলবে। তাই উনি এত রাত্রে সিগারেট কিনতে যাচ্ছিলেন।

শীতেশ কথাটা শোনামাত্র, দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, বলেছিল, না দাদা, আমার খুব গরম লাগছিল বলে ছাদে যেতে চাইছিলাম।

নীতিশ সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠেছিল, ত্থাখ্ ফোঁচা, আমার সঙ্গে চালাকি করিস না।

শীতেশের কী বিপদ! তখন সত্যিকথা বলারও উপায় ছিল না। কেন না, একবার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়া হয়ে গেলে, বাকীটা শোনায় 'সীতা কার বাপের' মতো। অথচ বেচারি সত্যি সত্যি ছাদেই যেতে চেয়েছিল। জীবনে যে এ-রকম কত দুর্দৈবই ঘটে! দাদা বৌদি কোনোদিনই বারন্দায় মাদুর বিছিয়ে বাতাস খেতে বসে না। শীতেশেরও সহসা ছাদে হাওয়া খেতে যাবার বাসনা কখনো তেমন হয় না। আজ থেকে কয়েক বছর আগের একটি বিশেষ গ্রীষ্মের রাত্রেই যেন, নিয়তি নির্দেশিত দৈব দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

শীতেশ তবু মিনমিন করে, নিজের সত্যবাদিতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল, বিশ্বাস করো দাদা, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলবো না।

সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর ভিন্নরূপ। বলেছিল, দ্যাখো ঠাকুরপো তুমি আবার যুধিষ্ঠির হবার চেষ্টা কোরো না। ওসব ন্যাকামো আমি একটুও সইতে পারি না।

শীতেশের তখন মনে হয়েছিল, ও শাঁখের করাতের তলায় পড়েছে। যেতে কাটে, আসতে কাটে। নীতিশ আবার সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে বলেছিল, উপকার করতে গেলাম, উনি এখন সাধু সাজতে এলেন। যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর।

সরস্বতী আবার তার উপরে ফোড়ন, তা-ই না বটে।

নীতিশ ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, যা চেয়েছিলি, তা পেয়েছিস্। কাজে লাগিয়েছিস্? অর্থাৎ শীতেশ সিগারেট খেয়েছে কী না, জিজ্ঞেস করেছিল।

শীতেশ এ ক্ষেত্রেও সত্যি কথা বলেছিল, খায়নি। কারণ তারপরেই যা শুরু হয়েছিল, তারপরে আর সিগারেট খাওয়া যায় না।

নীতিশ বলেছিল, তাহলে যা, ঘরে ঢুকে, সিগারেট টেনে ঘুমিয়ে পড় গিয়ে। এখন আর আজে বাজে গাইতে হবে না।

অগত্যা। একটু আগেই যারা পরস্পর যুদ্ধমান ছিল, তখন তারা ঐক্যবদ্ধ। সেই ঐক্যে ফাটল ধরাবার কথা. শীতেশ চিন্তা করতেই পারে না। ফলে সমস্যা এবং উপসর্গ আরো বেড়ে উঠতো। অসহায় অপরাধীর মতো ঘরে দরজা বন্ধ করে, কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরে যেন সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে, পর পর দুটো সিগারেট হুস্ হুস্ করে টানছিল।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল মুখোমুখি দু'ভাইয়ের সিগারেট খাওয়া। সরস্বতী মেনে নিয়েছে ঠিক, কিন্তু দু'ভাই যখন বন্ধুর মতো ব্যবহার করে তখন ওর জন্মগত পারিবারিক সংস্কার কেমন যেন কুপিত বোধ করে। আসলে সরস্বতী চায় দুজনকে দু'রকম দেখতে। অথচ দুজনেই তার সামনে যেন বন্ধু। সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী তো আছেই, ওরা মেয়েদের নিয়েও নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা আলাপ আলোচনা করে। আলোচনার মধ্যে হাসি ঠাট্টাই বেশি। সরস্বতীর দেখে শুনে মনে হয়েছে যেন অধিকাংশ মেয়েই ওদের দু'ভাইয়ের কাছে হাসি ঠাট্টার বস্তু। অনেক সময় সে ধরতেই পারে না, হঠাৎ কারোকে দেখে দু'ভাইয়ের হাসি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে কেন। উল্টো দিকের বাড়ির বড় গিন্নি ছোট গিন্নি, যাকেই দেখুক অমনি দু'ভাইয়ের হাসির ধুম লেগে যায়।

আসলে সরস্বতীর মনে একটু ব্যথা মেশানো ঈর্ষা আছে। নিজের স্বামী এবং দেবরকে সে সবসময়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কারণ ওরা তো কেবল হাসি ঠাট্টাই করে না। এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা সে সবটাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যদিও

শীতেশ বলতে গেলে তারই সমবয়সী। অন্তত কলেজের শিক্ষার দিক থেকে তুজনেই সমান। কিন্তু সেই শীতেশই যখন ওর দাদার সঙ্গে কথা বলে তখন যেন ছেলেটার নাগালই পাওয়া যায় না; এবং স্বামীর ক্ষেত্রেও তা-ই।

এইরকম ত্রয়ীর সংসারে সরস্বতীর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, তাই ঘটেছে। স্বামীকে ভালোবাসতে গিয়ে তার মনে হয়, সে ভালোবাসার ভাগ অনেকখানি তার ভাই দখল করে নিয়েছে। দেবরকে স্নেহ ও বন্ধুত্ব দান করতে গিয়ে ভাবে তার অনেকখানিই ওর দাদার দখলে চলে গিয়েছে। সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে এর বোধহয় কোনো শেষ নেই। অবিমিশ্র আলো আর যেখানেই থাক, জীবন বোধহয় এইরকম রৌদ্রমেঘের খেলাতেই বর্ণাঢ্য।

সরস্বতী স্বামী দেবরকে আর যা নিয়ে ধিক্কার দেয়, তা হলো সংসার বিষয়ে তুজনেই সমান আনাড়ি এবং উদাসীন। একজন চাকরি করে টাকাটি দিয়েই খালাস। তারপরে হিসাব নিকাশ কী করতে হবে না হবে দেখে শুনে তুমি চালাও। অবিশ্যি এমন না যে নীতিশ কখনো স্ত্রীকে টাকা কম দেয়। সরস্বতী নিজেও সেদিক থেকে লক্ষ্মীঠাকুরুণটি। সে তোমাকে ঋণী করে রাখতে পারে, তাকে ঋণী করে রাখতে পারবে না। এ বিষয়ে সে যেমন একদিকে স্বাধীন এবং শান্তি বোধ করে আর একদিক থেকে তেমনি মাঝে মাঝেই অভিযোগ দেখা দেয়। মনে করে তার ওপরে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে যে যার নিজের তালে আছে।

আর শীতেশ! একজন টাকা দিয়ে খালাস। আর একজন চাকরি খুঁজতে খুঁজতেই মাথা কিনে বসে আছে। বাজার করবার সময়টা পর্যন্ত তার নেই। দাদার সঙ্গে চায়ের কাপ নিয়ে বসে, সিগারেট ধ্বংস করতে বসে। আর একটা মেয়ে হাসতে হাসতে চোখ ঘুরিয়ে পাড়া চকিত করে বাজারে যাবে। নীতিশকে বলেও কিছু হয়নি। হবেও না কোনোদিন। সরস্বতী নিজেও যে চাঁপা মেয়েটির জন্য ভেবে মরে যাচ্ছে তা না। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মহিলা পুরুষদের মাথা

ব্যথার অন্ত নেই। চাঁপা বড় হাসকুটে মেয়ে। শরীরের বাড়ন্ত গড়ন মেয়েটাকে দিয়েছে এমন একটা শ্রী, যা ঢেউয়ের তরঙ্গের মতো, চারপাশে যেন তুলিয়ে দিয়ে যায়। সব মিলিয়ে চোখে পড়বার মতোই। আশেপাশের ভু-একজন বর্ষীয়সী মহিলা যে কেবল সরস্বতীর ঘরের জন্যই সাবধান করেছে তা না। ঘোষগিন্নি তো বলেই দিয়েছেন, কর্তাদেরই বা বিশ্বাস কী? তেঁতুলেবিছের সামনে অমন চকচকে পাখনা আরশোলা ঘোরাঘুরি না করাই ভালো। কী থেকে কী হয় কিছু বলা যায় না।

সরস্বতীর অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়েছে, ঘোষমশায় এখনো তেমন বিষওয়ালা তেঁতুলেবিছেটি আছেন কী না। জিজ্ঞেস করতে পারেনি। বুঝেছে অনেক প্রৌঢ়া গিন্নিও, সরস্বতীর ডাগর দাসীটিকে নিয়ে চিন্তিত। পাড়ার যুবক আর উঠতি যুবকেরা তো আছেই। কিন্তু এ কথা ঠিক, চাঁপার দিক থেকে আজ পর্যন্ত আপত্তির কিছু পাওয়া যায়নি। যদিও সরস্বতী যেন প্রাণ ধরে সব সময়ে মেয়েটাকে বিশ্বাস করতে পারে না। যতই হোক, চাঁপার চালচলনটা তো আর সরস্বতীর মতো একটি পরিবারের মেয়ের না। তার হাসি ঠাট্টা চালচলনের ভঙ্গি একটু আলাদা। সরস্বতীকে সব সময়েই তাকে বকা-ঝকার ওপর রাখতে হয়। তাতেও অবিশ্যি চাঁপাকে সামলে রাখা যায় না। কখন যে খিলখিল করে হেসে উঠবে তার কোনো ঠিক নেই। মেয়েটার বোধহয় একটু মাথা খারাপও আছে। তা না হলে একটা আরশোলাকে ঝাঁটা দিয়ে তাড়া করতে গিয়ে কেউ হেসে গড়িয়ে পড়ে না। খেতে বসে সকালবেলার বাজারের ঘটনা মনে করে কেউ আচমকা হেসে ওঠে না। ও-রকম পাগলুটে হাসিকে সরস্বতী আবার কেমন যেন ভয়ের চোখে দেখে। সংসারে কত কী যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে পারে তা কেউ বলতে পারে না।

তবে এটা ঠিক শীতেশ সম্পর্কে মেয়েটা যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে। সরস্বতী মনে মনে বলে, ছুঁড়ি ছোড়দা ছোড়দা

করে মলো। সকালবেলা বড়দার চায়ের আগে তার ছোড়দার চায়ের কথা মনে পড়ে। ছোড়দা কবে বলেছে শিলং মাছ খেতে ভালো লাগে, মেয়েটা বাজারে শিলং মাছ ছাড়া আর কিছু চোখে দেখতে পায় না। একদিন তো চাঁপার হাতে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল সরস্বতী। শীতেশ দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তার মাথার চুলের কোথায় একটা পায়রার ছোট্ট পালক পড়েছিল। পাশে সরস্বতী দাঁড়িয়ে। চাপা ছুটে এসে ডিঙি মেরে শীতেশের মাথা থেকে পালকটা তুলে নিয়ে বলেছিল, অ মা, ছোড়দার মাথায় এটা কী গো!

সরস্বতীর আর সহ্য হয়নি, চাঁপার হাতে একটা চাটি কসিয়ে দিয়ে বলেছিল, মুখে বলতে তোর কী হয়েছে। ছোড়দার মাথায় হাত না দিলে চলছে না?

কাকেই বা চাটি, কাকেই বা থাপ্পড়। তার পরেও মেয়েটা খিলখিল করে হেসে বলেছিল, আমি দূর থেকে দেখে ভাবছিলাম ছোঁড়দার মাথায় বুঝি পেজাপতি বসেছে। ভাবলাম ছোড়দার এবার বে লাগবে তা'লে।

তখন শীতেশ নিজেই হাত উদ্যত করে এগিয়েছিল, দেখবি তবে ফক্কড় মেয়ে।

চাঁপা দৌড়ে পালিয়েছিল। সরস্বতী জানে মুখে বা ওপরে যা-ই হোক, শীতেশকেই চাঁপা ভয় পায় বেশি। সরস্বতী এ কথাও জানে চাঁপার বয়স যত কমই হোক, যতই বাইরে হেসে দুলিয়ে একটু রঙ্গিনী চালে চলুক, ভিতরটা যেমন শক্ত আছে তেমনি মনটাও ভালো আছে। ইচ্ছা করলে পয়সার হিসাবে যখন খুশি এদিক ওদিক করতে পারে। আজ পর্যন্ত একটি পয়সারও হেরফের হয়নি। তবু হায়, সরস্বতী যে সংসারের একটি মেয়ে এবং বৌ, কেবল চাঁপাকে নিয়ে সংসার চালাতে অভিযোগ তার থাকবে বৈকি।

তথাপি সব মিলিয়ে তিনজনের সংসারটি চলছিল মন্দ না। চাঁপাকে যদি সংসারের একজন ধরতে হয় তবে চারজন। সরস্বতী যে মনের

দিক থেকে মোটামুটি শান্তি, স্বস্তি, এমন কি কিছুটা সুখেই আছে, তা এই দুপুরের বন্ধ ঘরের ছবিতেই ফুটে উঠেছে। ওর আঁচল খসা শিথিল বেশ, অলস শয়ন ভঙ্গি, খোলা চুল আর দু'হাতে ধরা বুকের ওপরে বই। বইটি এখন সত্যি ওর কাছে প্রায় পরিপূর্ণ টলটলে মধুভাণ্ড। যেন কোনদিকে কাত হয়ে পড়লেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। ও ওর প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক প্রেমোপাখ্যান পড়ছে।

এ সময়েই ব্যাজ্ ব্যাজ্ করে কলিংবেলটা বেজে উঠলো। সরস্বতী প্রথমটা শুনতেই পেলো না। দ্বিতীয়বার একটু বেশি সময় ধরে বাজলো। সরস্বতী ভুরু কোঁচকালো। দেওয়ালে ঘড়ি নেই যে দেখবে। কিন্তু ওর মুখে স্পষ্টই বিরক্তি। সন্দেহ নেই, চাঁপা তার দুপুরের টহল সেরে ফিরলো। থাক্, এখন দাঁড়িয়ে থাক্ কিছুক্ষণ বাইরে। এমন কিছু রাজকার্য বয়ে যাবে না। বাড়ির দাসীকে তার ইচ্ছামতো দরজা খুলে দিতে পারবে না। দিদির বাড়িতে রোজ যখন যেতেই হবে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কী দরকার। আরো দেরী করে ফিরলেই হয়। দিদির বাড়ি যাওয়া চাই। কিন্তু সেখানে তো বিজলী পাখা নেই। সেখানে আড্ডার মৌতাতটি শেষ করে, বৌদির ঘরের মেঝেয়, পাখার নিচে আঁচল বিছিয়ে না শুলে যে চলে না।

সরস্বতী আবার তার উপন্যাসের নায়িকাকে নায়কের আলিঙ্গন ও আশ্লেষ চুম্বনের, দপদপে বাখানে ফিরে যাবার চেষ্টা করলো। সেই মুহূর্তেই আবার ব্যাজ্-জ্-জ-জ্-জ্...! যেন থামতেই চায় না। আর কলিংবেলের এমন বিশ্রী আওয়াজও সরস্বতীর মোটেই পছন্দ নয়। যেন গলা ভাঙা প্যাঁচার ডাকের মতো। ক্রিং ক্রিং শব্দও তার পছন্দ না। আজকাল তো কতরকম জল-তরঙ্গের মতো শব্দের বেল বেরিয়েছে। যেন বাজনা বেজে যায়। কিন্তু নাঃ, মধুভাণ্ড বন্ধ করতেই হলো। গলা ভাঙা প্যাঁচার ডাক বেজেই চলেছে। সরস্বতী মেজাজ তিরিক্ষি করে খাট থেকে নেমে এলো। শীতেশ খেয়ে বেরিয়েছে, কেন না, তার ফেরবার আজ কোনো সময়

অসময় নেই। আজ তার জীবন মরণ সমস্যার দিন বলা যায়। পাওয়া চাকরিই পাবে, না আরো কয়েক মাস বসে থাকতে হবে, সেটাই আজ স্থির হবে। যা-ই হোক, সে এ-রকম সময়ে কোনোদিনই আসবে না। দরকার হলে উত্তরবঙ্গের বেকার বন্ধুদের সঙ্গে, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে বসে থাকবে, তবু বাড়ি আসবে না। নীতিশের তো কোনো প্রশ্নই নেই। অতএব চাঁপা ছাড়া আর কেউ না।

সরস্বতী খসা আঁচল শিথিল বেশ সামলাবার কোনো চেষ্টা করল না। চাঁপার সামনে কোনো দরকার নেই। ও শক্ত মুখে, বারান্দা দিয়ে গিয়ে, ঝনাৎ করে ছিটকিনিটা খুলেই ঝাঁজিয়ে উঠলো, দিদির বাড়ির আড্ডা যদি—।

কথা তার শেষ করা হলো না। সামনে দাঁড়িয়ে শীতেশ। শীতেশ ক্লান্ত নিচু স্বরে অপরাধীর মতো বললো, স্যরি বৌদি, তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।

সরস্বতী নিজেই তখন অবাক। থতমত খেয়ে বললো, আমি মোটেই ঘুমোইনি, শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। ভেবেছিলাম, সেই হতচ্ছাড়িটা দুপুরেই জ্বালাতন করতে ফিরে এসেছে। তা তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো!

হ্যাঁ। বলে শীতেশ দরজার ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু ওর শরীরে যেন বল নেই। চলতে কষ্ট হচ্ছে। ঘাড় নুয়ে পড়েছে। মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। মুখ শুকনো, বড় বড় চোখের কোণ দুটো বসা। দেখলেই বোঝা যায়, একটা লোক যেন সর্বাংশে পরাজয় মেনে ফিরে এসেছে। সরস্বতী চেয়ে দেখলো। কিছু বললো না। বলার কিছু নেই, ও জানে। শীতেশ ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। ও ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিলো। মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠলো।

শীতেশ ওর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আয়নার দিকে একবার দেখলো। নিজেকেই ঠোঁটটা বেঁকিয়ে যেন বিদ্রূপ করলো। তারপরে অস্ফুটে উচ্চারণ করেই বললো, যেমন কপাল করে এসেছ, তাই তো হবে। তার বেশি আর কাঁচকলা কী হবে। বলতে বলতে, এক

টানে গলা থেকে টাইটা খুললো। টেরিনের কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো খাটের ওপর। ঘামে ভেজা শার্টটা, ট্রাউজারের ভেতর থেকে টেনে তুলে, পটপট করে বোতাম খুলে, সেটাও ছুড়ে দিলো বিছানার ওপরে। তারপরে একবার বিছানার দিকে তাকিয়েও, ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে, বাইরের ঘরে গেল। পাখাটা খুলে দিয়ে, এক পাশে ছোট ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে রইলো।

মিনিটখানেক পরেই সরস্বতী এসে দরজায় দাঁড়ালো। তার চোখে মুখে স্পষ্ট উদ্বেগ। তার মনে এখন উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা, চাকরি না পাওয়াতেই কি শীতেশ এতখানি ভেঙে পড়েছে? না কি অন্য কোনো দুঃসংবাদ আছে। শীতেশকে এত শুকনো, ক্লান্ত রোদে পোড়া কালো দেখাচ্ছে কেন। যেন একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে গিয়েছে!

সরস্বতী মুখে বলে না, মনে মনে ওর স্বামী আর দেবরের চেহারা নিয়ে বেশ একটু গর্ব আছে। দু'ভাই-ই বেশ দীর্ঘ দেহ, মেদবর্জিত, না কালো, না ফরসা রঙের চেহারা। দুজনেরই বড় বড়, একটু টানা ধরনের চোখ। বিশেষ করে ওর স্বামীর। সে তুলনায়, শীতেশের চোখ একটু গভীর। অনেকটাই মায়ের মতো। অর্থাৎ সরস্বতীর শাশুড়ি ঠাকুরুণের মতো। দুজনের মুখের মধ্যেই এমন একটা সারল্য আছে, নিষ্পাপ ধরনের মুখ যেমন বলা হয়, অনেকটাই সেইরকম। অবিশ্যি সেজন্য, অনেক সময় একটু বোকা মনে হতে পারে। কিন্তু ওরা বোকা তা নয়, তা ওদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। চালাকির ঝিলিক আর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আলাদা। সরস্বতীর মনে আছে বিয়ের সময়ে সে নীতিশ সম্পর্কে শুনেছিল, ছেলেটি সবদিক থেকেই সুন্দর আর ভালো, কিন্তু একটু যেন ভালোমানুষ, বোকা বোকা ভাব।

সরস্বতীর যে কী মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। বোকা ছেলেদের ওর একটুও পছন্দ ছিল না। ভালোমানুষ আর বোকা কি এক? কিন্তু, আজ পর্যন্ত যে কথা ও মুখ ফুটে নীতিশকে পর্যন্ত বলেনি, তা হলো, শুভদৃষ্টির সময়েই ও নীতিশের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিয়েছিল, সকলেই ভুল বলেছে। তারপরে তো এই

বছরগুলোর জীবনে ও ভালো করেই দেখছে। আসলে একদিকে যেমন অজটিল সরল সহজ মানুষ ওর স্বামী দেবর, অন্যদিকে তেমনি ভারসাম্য বোধে বুদ্ধিপ্রাপ্ত, কাজের মানুষ, মনে মনে রীতিমতো ছেলেমানুষ ও রসিক।

নীতিশ আজকাল একটু মোটা হতে আরম্ভ করেছে। শীতেশ সেদিক থেকে ঋজু এবং শক্ত, অথচ কথায়, আচরণে অমায়িক। শীতেশের চুলে একটু আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। বড় চুল, লম্বা জুলফি, যা নিয়ে সরস্বতী ঠাটা করলেও, শীতেশ নিশ্চুপ। এমন কি নীতিশও মাঝে মাঝে পিছনে লাগে। বিশেষ করে, শীতেশের চুল ঠিক ঘন কোঁকড়ানো না হলেও, মাঝারি ঢেউয়ে বেশ দেখায়। চুলগুলো বড় করায়, সেই ঢেউ খেলানো সৌন্দর্য যেন কোথায় ব্যাহত হয়। আর এমন ঘন কৃষ্ণ কেশে, শীতেশ তেল মাখতে ভুলে গিয়েছে। যার চুল তেল মসৃণ থাকলে মুখ দেখা যায়। অথচ তেলের পাট নাকি আজকাল উঠেই গিয়েছে। কিন্তু নীতিশ এখনো বেশ তেলে জলে আছে। স্নানের পরে সুগন্ধি তেলটি না মাখলে তার চলে না।

সরস্বতী উদ্বিগ্ন মুখে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, শীতেশ চোখ খুললো না। সরস্বতীর মাথায় তখন আর উপন্যাসের নায়ক নায়িকা নেই। সে ডাকলো, ঠাকুরপো!

শীতেশ চোখ না খুলেই শব্দ করলো, উম্?

কী হয়েছে?

শীতেশ আগের মতোই, চোখ না খুলেই, জবাব দিলো, চাকরি হয়েছে।

শীতেশের জবাব শুনে, সরস্বতী তারপরে কী জিজ্ঞেস করবে, ভেবে পেলো না। চাকরি হয়েছে, অথচ এই অবস্থা! তার মানে কি? সরস্বতী সেই সর্পিল নদী স্রোত। হঠাৎ ওর মাথায় নতুন উৎকণ্ঠা জাগতেই জিজ্ঞেস করলো, তোমার দাদার খবর কি?

শীতেশ এবার অবাক হয়ে চোখ মেলে বললো, কেন, দাদার

আবার খবর কী? দাদা তো অফিসে গেছে।

তোমার দাদার খবর সব ভালো তো?

শীতেশ আরো অবাক হয়ে বললো, দাদার খবর খারাপ হতে যাবে কেন?

সরস্বতী জিজ্ঞেস করলো 'তবে তুমি ও রকম করছ কেন? চাকরি পেয়েছ বলছ, অথচ তুমি কি রকম হয়ে গেছ। কী হয়েছে তোমার? শরীর-টরীর খারাপ করেছে নাকি? বলতে বলতে সে শীতেশের দিকে এগিয়ে গেল।

শীতেশ অসহায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললো, শরীর আমার এখন ভালোই আছে। কিন্তু চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বারোটাও বেজে গেছে।

কেন গো, কেন ঠাকুরপো, কী হয়েছে আমাকে বলো।

সরস্বতী এগিয়ে গিয়ে, ইজিচেয়ারের কাছে, একটা চেয়ারে বসলো। আবার জিজ্ঞেস করলো, খুব বাজে চাকরি দিয়েছে বুঝি?

শীতেশ তেমনি ভঙ্গিতে ও স্বরেই বললো, চাকরিটা হয়তো ভালোই। আরো দু-চার বছর আগে ঢুকলে কোম্পানি হয়তো বিলেতেও ঘুরিয়ে নিয়ে আসতো।

সরস্বতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিলেতে যেতে পারবে না বলে কি তোমার এত ভাবনা?

শীতেশ তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললো, না না, তা বলছি না; বিলেতে যাবার কথা আমার মোটেই মনে হয়নি। ওটা একটা কথার কথা বলছি আর কি। আমাকে কোম্পানি যে পোস্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, দু-চার বছর আগে হলে, এই পোস্টের লোকদের বিলেত থেকে পাকাপোক্ত করে নিয়ে আসা হতো। যাকে বলে, একেবারে সাহেব বানিয়ে নিয়ে আসা।

সরস্বতী যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। বললো, তার জন্য বুঝি মাইনে কম দেবে?

শীতেশ ঘাড় নেড়ে বললো, তাও বলা যায় না। প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসাবে, সাত আট শো টাকা মোটেই কম বলা যাবে না।

সরস্বতী উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে বলে উঠলো, কম কী গো ঠাকুরপো, এ বাজারে সাত আট শো টাকা কি কম হলো? তোমার দাদা আর কত পায়?

শীতেশ বললো, কম তো মোটে বলিনি। আজকের চাকরির বাজারে, এটাকে একটা লটারির পুরস্কার পাওয়া বলতে পারো। কিন্তু ভেবেছিলাম, আই. এ. এস. পড়বো, তা আর কোনোদিনই হবে না।

কেন?

আমাকে চাকরি করতে যেতে হবে, কলকাতা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে।

পঁচিশ মাইল দূরে? রোজ?

না। চাকরির শর্ত হলো, আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। তার মানে আমি কোম্পানির সব সময়ের লোক বলতে পারো।

সরস্বতী প্রায় ভয় পেয়ে বললো, তার মানে কী, তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা কারখানায় থাকতে হবে?

শীতেশ বললো, না, তা না। তবে দরকার পড়লেই যেতে হবে। মানে অনেক রেসপনসিবিলিটি রয়েছে আমার। একটু বড় আর ভালো চাকরি পেতে গেলে, এরকমই হয়। কিন্তু আমি ভাবছি, সেখানে গিয়ে আমি থাকবো কোথায়। এক বছরের মধ্যে কোয়ার্টার পাবার কোনো আশা নেই।

তাহলে কোথায় থাকবে? তোমার কোম্পানি কিছু ব্যবস্থা করে দেবে না?

শীতেশ একটু সোজা হয়েছিল। আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললো, কোম্পানি চাকরি দিয়েছে, তাতেই মাথা কিনে নিয়েছে, আবার বাড়ির ব্যবস্থা? সে সব আমাকেই করতে হবে।

সরস্বতী রেগে উঠে বললো, কী করে তুমি ব্যবস্থা করবে। তোমার চেনাশোনা জায়গা না, নিজের লোক বলতে কেউ নেই। তুমি কার কাছে থাকবে, কে তোমার দেখাশোনা করবে, কোথায় খাবে, কোনো কিছুর ঠিক নেই। হুট করে গেলেই হলো। এ চাকরি তোমাকে করতে হবে না।

শীতেশ প্রায় সুপ্তোত্থিতের মতো, বিস্মিত স্বরে বললো, চাকরি করব না?

সরস্বতী গম্ভীরভাবে বললো, না। এত দূরে গিয়ে, অখাদ্য চাকরি করতে হবে না। আমি থাকব না, তোমার দাদা থাকবে না, একলা একলা তুমি কোথায় চাকরি করতে যাবে? এতদিন ধরে, এত কাণ্ড করে, এখন এই ব্যবস্থা?

শীতেশ সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে রইলো, সহসা ওর মুখে কোনো কথা যোগালো না। সরস্বতীর মুখ থমথম করছে, মুখ নত। শেষের দিকে তার গলার স্বরও যেন কেমন রুদ্ধ শোনালো। শীতেশ হতাশ-ভাবেই বললো, কিন্তু বৌদি, এত ভালো চাকরি আর আমি পাব না।

সরস্বতীর চোখে আবার রাগ দেখা দিলো। বললো, ভালো চাকরি কোথায়? এক কাঁড়ি টাকা মাইনে হলেই কি ভালো চাকরি হয়। তোমার চোখ মুখের অবস্থাটা দেখেছ? মোটের ওপর তোমার অত দূরে গিয়ে থাকা চলবে না।

শীতেশ বললো, তাহলে চাকরি করব কী করে?

রোজ এখান থেকে যাতায়াত করবে।

শীতেশ আঁতকে উঠে বললো, মরে যাবো বৌদি।

মরে যাবে?

যাবো না? ভোর ছ'টায় যে আমাকে রোজ কারখানায় হাজিরা দিতে হবে।

ভোর ছ'টায়? কেন, তুমি কি মজুর নাকি?

তাও বলতে পারো। কারখানার যা নিয়ম, আমাকেও ভোর

ছ'টায় যেতে হবে। কলকাতা থেকে যদি আমাকে রোজ যেতে হয়, তবে ভোর চারটেয় আমাকে বেরোতে হবে। মানে রাত থাকতেই। তা তো সম্ভব না।

এ সময়ে ব্যাঙ্ ব্যাঙ্ করে আবার কলিংবেল বেজে উঠলো। সরস্বতীর চিন্তিত উদ্বিগ্ন মুখে বিরক্তি ফুটলো। শীতেশ উঠতে যাচ্ছিলো, বললো, দেখি কে এলো।

সরস্বতী আগেই উঠে বললো, তুমি বোসো। কে আবার আসবে মহারাণী দুপুরের আড্ডা সেরে ফিরলেন।

বলতে বলতে সে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। চাঁপা চকিতে একবার সরস্বতীর মুখের দিকে দেখে নিলো। সরস্বতী ততক্ষণে পিছন ফিরে বাইরের ঘরে ঢুকেছে। যে চেয়ারে বসেছিল, সেই চেয়ারেই গিয়ে বসলো। চাঁপা আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে উঁকি দিলো। শীতেশকে দেখতে পেয়ে, প্রায় হাসতে যাচ্ছিলো। কিন্তু দুজনেরই মুখের অবস্থা দেখে, কেবল হাসি সামলে নিলো না, ওর কালো ডাগর চোখ দুটিতে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা ফুটলো। একবার এর মুখের দিকে দেখলো, আর একবার ওর মুখের দিকে। ওদিকে সরস্বতীর নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে, চোখে বিরক্ত ফুটছে।

শীতেশ বললো, চাঁপা, একটু চা খাওয়াবি?

হ্যাঁ, এখুনি করছি। বলেই চাঁপা সরস্বতীর দিকে একবার দেখে নিয়ে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

সরস্বতী ঝামটা দিয়ে বললো, সে খোঁজে তোমার কোনো দরকার নেই। তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, তাই করো গে।

চাঁপার কালো মুখ কালো হয় না, কিন্তু একটু অশান্তির ছায়া পড়ে। সে চলে যেতে উদ্যত হয়। শীতেশ প্রায় দয়া করে বলে ফেললো, হয়নি কিছুই। আমার চাকরি হয়েছে, বুঝলি?

ওম্মা, তাই নাকি গো ছোড়দা! চাঁপা প্রায় হাততালি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো।

দাসীর এত উচ্ছ্বাস সরস্বতীর সহ্য হলো না! সে ধমক দিয়ে

উঠলো, হয়েছে, তোমাকে আর ধিঙ্গিপনা করতে হবে না।

তথাপি চাঁপা বললো, শুনে যে আমার কী সুখ হচ্ছে গো বৌদি! ছোড়দার চাকরি হলে আমার কিন্তু একটা শাড়ি পাওনা আছে।

শীতেশ বললো, তা তো আছে। কিন্তু আমি আর কলকাতায় থাকব না। আমাকে চলে যেতে হবে, চাকরির জায়গায় গিয়ে থাকতে হবে।

চাঁপা জিজ্ঞেস করলো, একলা একলা?

হ্যাঁ।

তোমার দেখাশুনা কাজকর্ম কে করবে?

কী জানি। নিজেকেই বোধহয় সব করতে হবে।

তা কেন। আমিই তোমার সঙ্গে যাবো।

সরস্বতী কটকটে চোখে তাকিয়ে, অনেকক্ষণ চাঁপার বাচন সহ্য করছিল। এবার আর পারলো না। একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হাত তুলে ঝংকার দিলো, মুখপুড়ি তুই যাবি ঠাকুরপোর সঙ্গে? ভেবেছিস কি তুই, অ্যাঁ?

চাঁপা মার খাওয়ার ভয়ে, আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। সরস্বতীর চড় চাপড়টা প্রায়ই তাকে খেতে হয়, আর সেটা সে হাসিমুখেই খায়। সে রান্নাঘরের দরজার কাছ থেকে বললো, বা রে, কেউ না গেলে, ছোড়দাকে দেখবে কে?

সরস্বতী ধমকে উঠলো, চুপ কর, চুপ কর তুই। তোর মতো মেয়েকে পাঠাবো আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?

চাঁপার দিক থেকে আর কোনো সাড়া শব্দ এলো না। শীতেশ অনেকটাই নির্বিকার। যেন এমন কিছু ঘটেনি। অথচ সরস্বতী রীতিমত উত্তেজিত। তার কালো চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দরজার দিকে তাকিয়েই বললো, লাই পেয়ে পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। কোথায় কী বলতে হয়, তাও জানে না।

শীতেশ শান্ত গম্ভীরভাবে বললো, আমার মনে হয়, ও খারাপ

কিছু ভেবে বলেনি। এমনি একটা কথা মনে এসেছে, তাই—।

সরস্বতী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, এমনি-টেমনি আমি জানি না। কোন্ সাহসে ও বলে তোমার সঙ্গে যাবে? তুমি একলা একটা আইবুড়ো ছেলে কোথায় থাকবে না থাকবে ঠিক নেই, ও তোমার সঙ্গে যাবে?

শীতেশ তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললো, মাথা খারাপ! তাই আবার কখনো হয় নাকি। ও তো একটা পাগল।

সরস্বতী গজগজ করে বললো, পাগল! মেয়ের আর বয়স হয়নি। ওসব পাগলামি দু'দিনে সারিয়ে দেবো।

শীতেশ আর কথা বাড়ালো না। সরস্বতী বসতে যাবে, এমন সময় আবার ব্যাজ্ ব্যাজ্ করে কলিংবেল বেজে উঠলো। আর উঠলো তো উঠলোই, থামতে চায় না। সরস্বতী আর শীতেশ, নিজেদের মধ্যে একবার অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিনিময় করলো। এ সময়ে কে আসতে পারে, দুজনেই বুঝতে পারলো না। শীতেশ উঠে বললো, আমি দেখছি। মনে হচ্ছে, খুব তাড়া আছে, বাজিয়েই চলেছে।

শীতেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দেখা গেল, নীতিশ অসময়ে বাড়ি এসেছে। শীতেশ বলে উঠলো, দাদা তুমি! বাথরুম পেয়েছে, না?

নীতিশ উজ্জ্বল মুখে হাসতে যাচ্ছিলো। শীতেশের কথা শুনে ভ্রূকুটি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, মানে?

মানে যেভাবে কলিংবেল বাজাচ্ছিলে—।

রাসকেল্ ইডিয়েট! আমি তোর মতো পেটরোগা না, বাথরুমে ছোটবার জন্য কলিংবেল বাজাবো। বলে গট গট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

শীতেশের মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দাদার পিছনে পিছনে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, আমি তা বলিনি। আমি বলছি মানে পেতেও তো পারে।

নীতিশ গা থেকে একটানে কোটটা খুলে ফেলে বারান্দার রেলিং-এ

রেলিং-এ রাখতে যাচ্ছিলো, সরস্বতী এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলো। নীতিশ আবার ধমক দিয়ে উঠলো, উল্লুক তা পেতে পারে না, তোর মতো আমার পেট না।

শীতেশ কিছু বললো না। নীতিশ টাইয়ের নট খুলতে খুলতে বললো, আমি কোথায় একটা সুসংবাদ পেয়ে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে বাড়ি ছুটে এলাম, রাসকেলটা বলে কিনা বাথরুমে পেয়েছে! মারবো এক থাপ্পড়।

বলে টাইসুদ্ধই হাত তুললো। শীতেশ সরে গিয়ে ঘাড় কাত করলো সরস্বতী বললো, হয়েছে থাক, এখন সুসংবাদটা কী শুনেছ সেটা বলো।

নীতিশ যেন এবার একটু অবাক হলো। স্ত্রী আর ভাইয়ের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে দেখে বললো, কেন, আমার সাহেব যে খবর দিলো ফোঁচার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট হয়ে গেছে, কাল থেকেই চাকরিতে জয়েন করতে হবে।

সরস্বতী গম্ভীর মুখে বললো, তোমার সাহেব খবর ঠিকই দিয়েছে। কিন্তু চাকরি যা হয়েছে তা তোমার ভাইয়ের মুখে শোনো। বলেই সে নীতিশের কোট আর টাই নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। নীতিশ অবাক চোখে তাকালো শীতেশের দিকে। বললো, আমি যে শুনলাম, তোকে খুব ভালো র‍্যাংক দিয়েছে। যে সাহেব তোর ইণ্টারভিউ নিয়েছে সে খুশি। প্রোডাকশনের ব্যাপারে এফিসিয়েন্সি দেখাতে পারলে ম্যানেজারিয়াল র‍্যাংকেও চান্স পাওয়া যেতে পারে? নীতিশ প্রায় একদমে কথাগুলো বলে গেল।

শীতেশ বললো, হ্যাঁ, যা যা শুনেছ, সে সবই ঠিক। খুবই রেসপন্সিবল পোস্ট।

নীতিশ অসহায় বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, তবে আর কী। ওরকম প্যাঁচার মতো মুখ করে আছিস কেন সবাই?

সরস্বতী বললো, প্যাঁচার মতো মুখ হবে না তো কি লক্ষ্মীর মতো মুখ হবে?

নীতিশ কিছুই বুঝতে পারলো না, সরস্বতীও তা বোঝাবার চেষ্টা করলো না, সে গলা তুলে বললো, চাঁপা চা বেশি করে করিস।

রান্নাঘর থেকে জবাব এলো, করে ফেলেছি।

নীতিশ শীতেশের দিকে তাকিয়ে প্রায় আদেশের সুরে বললো, এই কোঁচা, আয় ঘরে আয় তো, ব্যাপারটা শুনি আগে সব। আমার যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বলে সে বসবার ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসলো।

শীতেশ পিছনে পিছনে গেল, তার পিছনে সরস্বতী। শীতেশ বললো, ব্যাপারটা অবিশ্যি এমন কিছু না। আমাকে সেখানে গিয়ে থাকতে হবে।

কোথায়?

যেখানে আমাকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

নীতিশ প্রায় ধমকের সুরে বললো, তা থাকতে হবে তাতে কী হয়েছে?

সরস্বতী বললো, কলকাতা থেকে সে জায়গা পঁচিশ মাইল দূরে।

নীতিশ বললো, একশো মাইল দূরে হোক, তাতেই বা কি। চাকরির জায়গায় তো যেতেই হবে। আর যদি কলকাতা থেকে রোজ যাতায়াত করা যায়, তাহলে তা-ই করতে হবে।

শীতেশ বললো, চটকলের ব্যাপার। ভোর ছ'টায় রোজ হাজিরা দিতে হবে।

নীতিশ বললো, তা-ই দিতে হবে। তাহলে সেখানে গিয়েই থাকতে হবে।

সরস্বতী বললো, কোথায় গিয়ে থাকবে?

নীতিশ হঠাৎ কোনো জবাব না দিতে পেরে, শীতেশের দিকে তাকালো।

শীতেশ বললো, আজ আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, এক বছরের মধ্যে কোনো কোয়ার্টার পাওয়া যাবে না। থাকবার ব্যবস্থা আমাকে

নিজেই করতে হবে। আর দরকার হলেই যেন কারখানায় অ্যাটেণ্ড করতে পারি। যখন তখন স্টেশন লীভ করা চলবে না।

নীতিশ প্রায় মিনিট খানেক চুপ থেকে বললো, কাল কখন যেতে বলেছে?

শীতেশ বললো, কাল সকাল সাতটায় কারখানার ম্যানেজারকে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। তারপর থেকে রোজ ভোর ছ'টায় জয়েন। বেলা ন'টায় ব্রেকফাস্ট, বেলা এগারোটা থেকে বেলা দুটো লাঞ্চ, বিকেল পাঁচটা অবধি ডিউটি। তারপরেও কোনো দরকার পড়লে থাকতে হবে, যেতে হবে।

নীতিশ বললো, প্রথমটা একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু তা মেনে নিতে হবে। আমার মনে হয় চাকরির জায়গায় গেলেই, ওখানে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হয়তো একদিনেই হবে না। কয়েক দিন লাগবে। ওখানে যদি অফিসারদের কোনো মেস না থাকে তবে একটা বাসা ভাড়া করতে হবে। একটা লোক রাখতে হবে কাজকর্ম রান্নাবান্না করার জন্য। এ ছাড়া তো আমি আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

সরস্বতী বলে উঠলো, এত দিন ধরে যে শুনে এলাম, কী এলাহি চাকরি না জানি হবে. তা এটা কি হচ্ছে? এটা কি একটা চাকরি নাকি?

নীতিশ চোখ কপালে তুলে প্রায় চিৎকার করে বললো, কী বললে? এটা কি একটা চাকরি নাকি? এর থেকে বড় চাকরি আবার কী হতে পারে। চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যে এরকম চাকরি আজকালকার দিনে পাওয়া যায়! আজ একটা রীতিমত আনন্দের দিন। কালই বাবাকে চিঠি লিখে জানাতে হবে।

নীতিশের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটলো। শীতেশ সরস্বতীর দিকে দেখে বললো, সবই ভালো। নতুন জায়গায় গিয়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করাটাই—।

নীতিশ বাধা দিয়ে বলে উঠল, ওসব ভেবে লাভ নেই। ওখানকার

লোকেরা খায় এবং থাকে। তুই আগে ওখানে যা, ম্যানেজার একজন বাঙালী ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বল্। আরো অন্যান্য স্টাফ আছে, জলে পড়তে হবে না। কয়েকটা দিন একটু কষ্ট হবে। তা আর কী করা যাবে।

সরস্বতীর গম্ভীর গলা শোনা গেল, তার মানে ঠাকুরপো তাহলে আর আমাদের কাছে থাকছে না।

নীতিশ বললো, থাকাথাকি আবার কী। ছুটিছাটাতে আসবে, তারপরে—।

সরস্বতী ততক্ষণে চোখে আঁচল চেপেছে এবং উদ্গত কান্না তার শরীরে ব্যক্ত হয়ে উঠলো। নীতিশ ব্যস্ত হয়ে বললো, আরে এতে কান্নার কি আছে?

সরস্বতী কান্না জড়ানো স্বরেই বললো, তোমরা তা কি করে বুঝবে। এমনিতেও কোনোদিন বোঝনি, এখনোও বুঝবে না। আমি আর কলকাতায় থাকতে চাই না। আমাকে জলপাইগুড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তোমরা দু'ভাই মনের সুখে চাকরি করো।

নীতিশ আর শীতেশ দুজনে অসহায়ভাবে, পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করলো।

নীতিশ বললো, একে কী বলি বল্ তো। চাকরি করতে হলে, লোককে বাইরে যেতে হবে না? ফোঁচা তো প্রত্যেক সপ্তাহেই একদিন আসতে পারবে।

শীতেশ বললো, না এসে কি আমিই থাকতে পারবো নাকি?

এতক্ষণ কারো লক্ষ্য পড়েনি। চাঁপা কখন টেবিলের ওপর চা বিস্কুট সাজিয়ে রেখে দরজার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তারও চোখে জল।

নীতিশ ধমক উঠলো, এই চাঁপা, তুই আবার কাঁদতে লাগলি কেন, এ্যাঁ?

চাঁপা ফোঁপানো স্বরে বললো, ছোড়দা চলে যাবে।

নীতিশের মুখ রাগে আর বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠলো। খেঁকিয়ে

বললো, খুব হয়েছে যা, আর প্যানপ্যান করতে হবে না। কোথায় আজ একটা শুভদিন, আনন্দের দিন। এরা চোখের জল ফেলে, দিনটাকে মাটি করে দিলে।

সরস্বতী তার কান্নার মধ্যেই ফুঁসে উঠলো, ওই মুখপুড়িকে এখানে এসে কে কাঁদতে বলেছে? ও ওর কাজে যাক্ না।

চাঁপা সরে গেল। নীতিশ চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিয়ে, গলা খাকারি দিয়ে সরস্বতীর দিকে ফিরে বললো, তোমারও কান্নাকাটি করার কোনো মানে হয় না। একটা শুভ কাজ কি এমনি হয়? জানি, তোমার খুবই কষ্ট হবে। কলকাতায় এসে অবধি তিনজনে একসঙ্গে ছিলাম। ফোঁচাকে এখন থেকে তার নিজের কাজের জায়গায় গিয়ে থাকতে হবে। তার মানে এই নয় যে আর দেখা হবে না। সপ্তাহে একদিন তো আসতেই পারবে। ইলেকট্রিক ট্রেনে কলকাতায় আসতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে।

সরস্বতী আরক্ত চোখ আঁচলে মুছে বললো, কিন্তু ঠাকুরপো যে বলছে, ছুটিছাটা বলে ওর কিছু নেই। ও কোম্পানির চব্বিশ ঘণ্টার লোক।

নীতিশ শীতেশের দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বললো, ওটা একটা গাধা। ওর কি কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে নাকি? যে কোনো রেসপনসিবল চাকরির শর্তই হলো তাই, তুমি কোম্পানির সব সময়ের লোক। তার মানে কি তাকে দিন রাত্রি কাজ করতে হয়? না, সে কোনো ছুটি পায় না? পুলিশ মিলিটারি অফিসাররা কি ছুটি পায় না? তাদেরও তো সব সময়ের চাকরি।

সরস্বতী তবু যেন স্বস্তি পেলো না। শীতেশের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, কিন্তু ঠাকুরপো যখন বাড়ি এলো, তখন যদি ওর চোখ মুখ দেখতে—কালো পোড়া মুখ, চোখের কোল বসা। আমার ভীষণ ভয় হয়ে গিয়েছিল।

নীতিশ বললো, রাসকেল একটা। কোথায় নাচতে নাচতে বাড়ি আসবে, তা না ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি এসেছে।

শান্তেশ বললো, চাকরি পেয়ে আমার আনন্দই হয়েছে। কিন্তু এখন আমি রোজ রোজ ভোর ছ'টায় কী করে পঁচিশ মাইল ঠেঙিয়ে গিয়ে জয়েন করবো?

নীতিশ ধমক দিয়ে বললো, রোজ রোজ মানে কি। যে কয়দিন সেখানে একটা থাকবার ব্যবস্থা না করা যায়। তুই কি একেবারে দুধের শিশু নাকি? বললাম তো, সেখানে গেলে, সকলের সঙ্গে কথা বললেই দেখবি, একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে যারা ওখানে চাকরি করতে গিয়েছিল, তারা যে ভাবে ব্যবস্থা করেছে, তুইও সে-রকম ব্যবস্থা করবি। এমন তো না যে, অজ পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছিস। খাবার হোটেল নিশ্চয়ই আছে। থাকবার হোটেলও থাকতে পারে। পারে কেন, নিশ্চয়ই আছে। তবে ওসব হোটেলে তো আর তুই ঘরের সুখ সুবিধা পাবি না। তা কোনো হোটেলেই পাওয়া যায় না।

তারপরেই হঠাৎ যেন নীতিশের কিছু মনে পড়ে গেল, সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, হ্যাঁ, মনে পড়ে গেছে, আমার ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হরিদাস চক্রবর্তীর বড় শালা সেই চটকলের লেবার অফিসে কেরানীর কাজ করে। হরিদাসবাবুকে দিয়ে কালই আমি টেলিফোনে কথা বলিয়ে দেবো, যেন মিলের কাছাকাছি, শতখানেক টাকার মধ্যে তোর একটা আলাদা ফ্ল্যাট দেখে দেয়। ব্যস্, মিটে গেল, একটা চাকর রাখবি, সে-সব ব্যবস্থাও হয়ে যাবে, তোফা থাকবি, খাবি, চাকরি করবি, আর—।

হঠাৎ বাধা পড়লো, চাঁপার গলা শোনা গেল, বড়দা, চাকর রাখবার কী দরকার, আমিই তো ছোড়দার সঙ্গে যেতে পারি।

নীতিশ আবেগ ভরে আরো অনেক কথা বলতে যাচ্ছিলো। বাধা পেয়ে শুধু যে বিরক্ত হলো, তা-ই না, চাঁপার কথা শুনে রাগে আর বিস্ময়ে, সহসা তার মুখে কোনো কথাই যোগালো না। সে সরস্বতীর দিকে ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। শান্তেশও বিরক্ত। সরস্বতীর মুখের অভিব্যক্তি অবর্ণনীয়। তার আয়ত টানা টানা চোখ দুটি জ্বলে উঠলো, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু চাঁপাকে একটি কথাও বললো

না। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল নীতিশের ওপরে। বললো, এবার দেখো, আদর দিয়ে দিয়ে ছুঁড়িকে কোথায় তুলেছো।

নীতিশ চিৎকার করে বললো, আমি আদর দিয়েছি ?

সরস্বতীর গলাও কম উঠলো না, দাওনি ? তুমি আর ঠাকুরপো দুজনেই ওকে আসকারা দিয়ে মাথায় তুলেছো।

শীতেশ গোবেচারার মতো বললো, আমি আবার ওকে কবে আসকারা দিলাম।

সরস্বতী ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখের তারা কাঁপিয়ে বললো, দাওনি তো কি আর ও এমনি এমনি কাঁদছে আর তোমার সঙ্গে যাবার বায়না ধরছে ? একে সোমত্ত মেয়ে, তায় ঝি, সে বলে কী না তোমার সঙ্গে গিয়ে থাকবে ?

চাঁপা বলে উঠলো, থাকবো বলতে কী বলছো বৌদি। চাকর রাখা হবে তাই—

চোপ্। চোপরাও। নীতিশের চিৎকার গোটা বাড়িটাই যেন কেঁপে উঠলো।

সরস্বতী ওর বিবাহিত জীবনে স্বামীর এমন প্রচণ্ড চিৎকার কোনোদিন শুনতে পায়নি। ওর মুখেও ভয়ের ছাপ পড়লো। শীতেশ কী করবে বুঝতে পারছে না। ও একবার কিছু বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঠোঁট নাড়ল মাত্র। শব্দ বেরোলো না। নীতিশ চাঁপার দিকে ঝটিতি এগিয়ে গেল, বলল, আমার ভাইয়ের কাজ করতে তুই যাবি, এত বড় সাহস ?

চাঁপা কিন্তু নড়লো না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সরস্বতী বলে উঠলো, থাক্, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত দিও না। বলে চাঁপাকে ফুঁসে উঠে বললো, যা মুখপুড়ি, যা, এখান থেকে যা।

চাঁপার চোখে জল। ও মাথা নিচু করে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, ভালোর জন্যই বলছিলাম।

চাঁপা চলে যাবার পরে, তিনজনেই চুপ। খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। সরস্বতীর মুখের মেঘ প্রথমে কাটল। স্বামীর এই

রুদ্রমূর্তি দেখে, বিশেষ করে চাঁপাকে শাসন করতে দেখে, তার আত্মার কোথায় যেন একটু শান্তির জল ছিটিয়ে পড়েছে। নীতিশের মুখের দিকে তাকিয়ে, সে যেন গর্ব বোধ করলো।

নীতিশের মুখও কোমল হয়ে উঠলো, গলার স্বরও শান্ত। বললো, ভুল হয়ে গেল।

সরস্বতী আর শীতেশ দুজনেই নীতিশের দিকে অবাক চোখে তাকালো। নীতিশ শান্তভাবে চেয়ারে বসে, মাথা নেড়ে নেড়ে বললো, ভুল হয়ে গেল। মেয়েটাকে ভুল বুঝেছি আমরা।

সরস্বতীর আত্মার শান্তি বিস্মিত হলো। জিজ্ঞেস করলো, তার মানে?

নীতিশ বললো, মেয়েটার মধ্যে ভালোবাসা আছে।

সরস্বতী আর শীতেশ পরস্পরের মধ্যে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলো। সরস্বতীই আবার জিজ্ঞেস করলো, ভালোবাসা মানে?

নীতিশ বললো, ভালোবাসা মানে ভালোবাসা। মেয়েটার প্রাণে ভালোবাসা আছে, মানে আমাদের ফ্যামিলির প্রতি, মানে আমাদের সকলের ওপরেই ওর খুব মায়া পড়ে গেছে। তা না হলে ওভাবে ও বলতে পারতো না।

শীতেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ঠিক বলেছো দাদা, আমারও তাই ধারণা। মেয়েটার মনটা ভালো, আসলে ছেলেমানুষ তো—

অন্যদিকে, ম্যাজিকের মতো সরস্বতীর মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, বড্ড ছেলেমানুষ, নাক টিপলে দুধ বেরোয়। তবে যাও, ওকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

নীতিশ বললো, আরে দূর, মাথা খারাপ নাকি। মেয়েটা ভালো, কিন্তু বোকা। তবে হ্যাঁ, ফোঁচার যখন বিয়ে হবে, তখন যদি চাঁপা থাকে, তবে যেতে পারে। আরে ফোঁচা তো এমনিতেই বেয়ারা পাবে, অফিসের খরচায়।

শীতেশ এবার একটু উৎসাহিত হয়ে বললো, তাই নাকি?

তাই নাকি মানে? যা একখানা কোয়ার্টার পাবি, কলকাতায় ও-রকম কোয়ার্টার মাসে দু'হাজার টাকা দিলেও পাওয়া যাবে না।

আমি তো চটকলের কোয়ার্টার দেখেছি, গঙ্গার ধারে, একেবারে প্যালেশিয়াল বিল্ডিং, রাজকীয় সাজ। তোর বৌদি গেলে হয়তো আর এখানে আসতেই চাইবে না।

সরস্বতী ঝামটা দিয়ে উঠলো, থাক, আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন?

নীতিশ সরস্বতীর হাত টেনে ধরে উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে কী যেন বলতে গেল।

সরস্বতী চকিতে একবার শীতেশের দিকে দেখে, লজ্জায় লাল হয়ে বললো, আহ্ কী হচ্ছে? মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

নীতিশও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গলা খাঁকারি দিলো। তারপরেই আবার বললো, ফোঁচা, তুই একটা আস্ত ইডিয়ট।

শীতেশ অবাক হয়ে বললো, কেন?

আজ একটা কত বড় আনন্দের দিন, তোর কোনো ধারণা আছে? নে, একটা সিগারেট খা, তাহলে তোর মাথা খুলবে।

শীতেশ এতক্ষণে মিষ্টি হেসে বললো, তোমার কথা শোনার পরে তাই মনে হচ্ছে। আসলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, চিনি না শুনি না, কোথায় গিয়ে পড়ব—

হাঙরের মুখে পড়বি, গাধা। কী একটা চাকরি পেলি, পরে বুঝবি। এর তুলনায় একটা ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি তুচ্ছ।

তারপরে সরস্বতীর দিকে ফিরে বললো, ওগো শুনছ, আজ একটু সেলিব্রেট করতে হবে। আজ আমরা বাইরে খেতে যাবো। সেইজন্যই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু দ্যাখ ফোঁচা, আজ তোরই খাওয়াবার কথা। তোর কাছে টাকা নেই জানি, তা আমিই আজকের খরচটা ধার দিচ্ছি তোকে।

শীতেশ সিগারেট ধরিয়ে বললো, সুদ সুদ্ধ শোধ দেবো।

এ সময়েই সরস্বতী গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু গম্ভীর মুখেই না, ওর শরীরের ভঙ্গিই বলে দিল, রীতিমত রোষবহ্নি ওর ঝটিতি নিষ্ক্রমণে।

নীতিশ শীতেশ তুজনেই একবার পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করলো। শীতেশ বললো, তুমিই ছানা কাটিয়ে দিলে।

নীতিশ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কী রকম ?

কেন তুমি চাঁপার প্রশংসা করতে গেলে ?

প্রশংসা কোথায় করলাম ! আমি তো সত্যি কথা বললাম।

সব সময়ে সত্যি কথা বললেই হলো ?

নীতিশ ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড শীতেশের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে গম্ভীর মুখে বললো, হুঁ, তুই দেখছি আজকাল আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছিস। মেয়েদের মন বুঝতে শিখে গেছিস।

মাইরি দাদা—।

থাক্, বাজে কথা শুনতে চাই না। কোথায় কার সঙ্গে কী করে বেড়াচ্ছিস, তুই-ই জানিস্।

এ মা, দাদা তুমি—।

থাক্, মেয়েদের মতো ন্যাকামি করে এ মা ও মা বলতে হবে না। মোটের ওপর, য়ু আর দ্য রুট অব্ অল্ ইভ্ল্স্। তুই যদি আমার ভাই না হতিস, তোকে খচ্চর বলে গালাগালি দিতাম, ইয়েট য়ু আর এ সাবলাইম মিউল্।

তার মানে, সেই তো আমাকে খচ্চরই বললে ?

নীতিশ এবার রীতিমত চিৎকার করে উঠলো, বলেছি, বেশ করেছি, য়ু আর এ টাইপ অব দ্যাট অ্যানিমেল। তা না হলে, এরকম একটা চাকরি পাবার পরেও কী করে তুই মুখ শুকিয়ে বাড়ি এলি ? এখন আমাকে বলছিস, ছানা কাটিয়ে দিলাম ? থাকা খাওয়ার ভাবনায় উনি একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। ফুটপাতে থাকবি, রাস্তার কলে জল খাবি, চৌবে আর পাঁড়েজীদের দোকানের পুরি তরকারি খেয়ে থাকবি। এত সুখ কিসের ?

শীতেশ সিগারেট টানতে ভুলে গেল। হাঁ করে নীতিশের মুখের দিকে তাকিয়ে, হতবুদ্ধি হয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলো। প্রায়

এক মিনিট পরে, ঢোক গিলে বললো, সে চ্যাপ্টার তো ক্লোজ হয়ে গেছে। আমি তো বললাম, প্রথমটা ঘাবড়ে গেছলাম। এখন আর আমার কোনো ভয় নেই।

নীতিশ গম্ভীর হয়ে বললো, মেজাজে আছ তো যাও, তোমার বৌদির মেজাজটি আগে ঠিক করগে, তারপরে বাকী কথা হবে।

শীতেশের ঠোঁটের কোণে প্রায় হাসি বিস্ফারিত হতে যাচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি ঠোঁট কুঁচকে, দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, তবে, মিউল বলাটা কিন্তু তোমার ঠিক হয়নি।

নীতিশ খেঁকিয়ে কিছু বলতে যেতেই, শীতেশ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সরস্বতীর ঘরে গিয়ে দেখলো, সে খাটের এক পাশে গালে হাত, দিয়ে, চুপচাপ বসে আছে। শীতেশ খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বললো, এ কি, তুমি বসে আছ এখনো? তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

সরস্বতী মুখ না ফিরিয়েই বললো, কেন?

বাঃ, আমরা বেড়াতে যাবো, বেড়িয়ে খেতে যাবো।

সরস্বতী নিরুত্তেজ গম্ভীর স্বরে বললো, তোমাদের দু'ভাইয়ের সুখের দিন, তোমরা যাও। আমি যাবো না।

আমাদের সুখের দিন মানে? আমাদের সুখের দিন কি তোমার দুঃখের দিন?

সরস্বতী সে কথার কোনো জবাব দিলো না। শীতেশ সরস্বতীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, প্লিজ বৌদি, ওঠো, তুমি না গেলে, আমি দাদা কেউই যাবো না।

সরস্বতী একই ভঙ্গিতে বললো, তা হলে যেও না।

শীতেশ করুণ মুখে সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রায় এক মিনিট কোনো কথা বললো না। মুখের ভাব আরো করুণ, প্রায় ব্যথার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। সরস্বতী আস্তে আস্তে মুখ তুলে শীতেশের দিকে তাকালো। ওর আয়ত চোখের তারা চিকচিক করছে, ঠোঁটের কোণ একটু কেঁপে গেল। কান্না না, শীতেশের করুণ মুখ দেখে, সরস্বতীর হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সামলে রাখছে। জিজ্ঞেস করলো, কী

হলো, সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শীতেশ হঠাৎ নিচু হয়ে বসে পড়ে, সরস্বতীর দুই পা চেপে ধরলো, বললো, তোমার পায়ে পড়ি বৌদি— ।

সরস্বতী কথার মাঝখানেই একটা আর্তনাদ করে, খিলখিল করে হেসে, খাটের ওপর লুটিয়ে পড়লো। চিৎকার করে বললো, ছাড়ো ছাড়ো, ভীষণ কাতুকুতু··· ।

শীতেশ বরং এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিলো। সরস্বতীর পায়ের গোড়ালির নিচে দু'হাতের আঙুল বসিয়ে বললো, আগে বলো, তুমি যাবে।

সরস্বতীর অবস্থা তখন প্রায় হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের মতো। হাসি চিৎকার দাপাদাপি একসঙ্গে চলছে এবং সেই সঙ্গে কেবল একটা কথাই উচ্চারণ করতে পারছে, ঠাকুরপো—ঠাকুরপো— !

নীতিশ এ ঘরে ছুটে এসেই হাঁক দিল, এই ফোঁচা, কী করছিস, রাসকেল্ ?

বৌদির পায়ে ধরেছি।

সরস্বতী তখন স্বামীর কাছে কাতর প্রার্থনা করছে, ওগো, ঠাকুরপোর হাত থেকে আমার পা ছাড়াও।

নীতিশ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে, শীতেশের কান ধরে টেনে দিলো। বললো, ছাড় ছাড়, পা ছাড়—বলছি।

শীতেশ বললো, বৌদি আগে বলুক, আমাদের সঙ্গে যাবে।

নীতিশ বললো, সে আমি দেখছি। তুই ছাড়, পালা এখান থেকে।

শীতেশ সরস্বতীর পা ছেড়ে দিয়ে, ঘর থেকে যাবার আগে একবার নীতিশের দিকে তাকালো। নীতিশ ধমক দিলো, পালা ।

শীতেশ পালালো। সরস্বতী তখন গা থেকে আঁচল খসা আলুথালু বেশে, কাত হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে।

নীতিশ সরস্বতীর পাশে বসে বললো, রাসকেল্‌টার কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। তোমার পায়ে যে এত সুড়সুড়ি লাগে, তা ও জানে না।

বলে, সরস্বতীকে এক টানে বুকের কাছে তুলে, আদর করে বললো, এসো।

বলেই এত বিগলিত হয়ে উঠলো, মুহূর্তে সরস্বতীর রক্তিম ঠোঁটে একটি চুম্বন এঁকে দিল। ফলে সরস্বতী ঝটিতি ছিটকে পড়লো খাটের আর এক দিকে। লজ্জায় আর ভয়ে, খোলা দরজার দিকে একবার দেখে, নিচু গলায় ধমকে উঠলো, ছি! ছি ছি ছি, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? দরজা খোলা, ঝি কাজ করছে, ছোট ভাই রয়েছে!

নীতিশের দু'চোখে তখন কেবল মদির মুগ্ধতা। সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে বললো, কী করবো বলো, চাপতে পারলাম না। তোমাকে যে এখন কী দেখাচ্ছে না—

বলে সে সরস্বতীর দিকে আবার এগোবার উদ্যোগ করলো। সরস্বতী বুকের ওপর আঁচল টানতে টানতে, চোখ পাকিয়ে বললো, খবরদার, অসভ্যতা কোরো না। যাও ওঠো। এসব করলে, আমি কোথাও যাবো না।

নীতিশ যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো। বললো, বেশ ঠিক আছে। তাহলে তুমি তৈরি হয়ে নাও, কেমন?

সরস্বতী জবাবে ওর লাল টুকটুকে জিভটি দেখিয়ে, ভেংচে দিলো।

নীতিশ একটু চোখ ঘুরিয়ে, পরম স্বস্তিতে বেরিয়ে গেল।

তারপরেই শুরু হয়ে গেল তিনজনের তৈরি হবার পালা। দু'ভাইয়ের তেমন দেরি হলো না। সরস্বতীর চুল বাঁধাই এক বিরাট ব্যাপার। তা ছাড়া আনুষঙ্গিক প্রসাধন এবং পোশাক তো আছেই। চাঁপা ওকে সাহায্য করছে বটে, কিন্তু বেচারির মুখ শুকনো বিমর্ষ। সাজগোজ হয়ে যাবার পরে, সরস্বতী চাঁপাকে ডেকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললো, আজ রাত্রে তোর দিদির বাড়িতে খাবি, একলার জন্য আর রাঁধতে হবে না। সিনেমা দেখতে যাবি নাকি?

চাঁপা গম্ভীর মুখে বললো, কার সঙ্গে যাবো?

সরস্বতী বললো, কেন, তোর দিদির মেয়ে পারুলের সঙ্গে যাবি?

চাঁপা চুপ করে রইলো। সরস্বতী আবার বললো, আমরা রাত্রি

দশটা নাগাদ চলে আসবো, তুই তার মধ্যেই চলে আসবি।

চাঁপা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তারপরে সবাই মিলে, একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সিতে প্রথমে গঙ্গার ধারে, সেখান থেকে পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোঁরায়। নীতিশ গম্ভীর হয়ে বললো, আজ আমাকে একটু বীয়র পান করতে হবে।

সরস্বতী আঁতকে উঠে বললো, মানে, মদ?

নীতিশ বললো, না না মদ না, বীয়র। তুমিও খেতে পারো।

সরস্বতী বললো, ইস্, ওয়াক্। আমি তো দূরের কথা, তুমিও খেতে পারবে না।

নীতিশ বললো, আর বীয়রে নেশা হয় না, খিদে বাড়ে। আমি আর ফোঁচা একটু খাবো।

সরস্বতী বললো, ওসব আমাকে শেখাতে হবে না। এর আগেও তুমি বীয়র খেয়েছ। তোমার চোখ লাল হয়েছে, আবোল তাবোল বকেছ। ওসব চলবে না।

নীতিশ বিগলিত সরে বললো, লক্ষীটি অনুমতি দাও। তুই কি বলিস ফোঁচা?

শীতেশ ভালো মানুষের মতো বললো, একটু খেতে পারি। শুনেছি বড্ড তেতো।

সরস্বতী নিচু স্বরে ধমকের সুরে বললো, বলছি, ওসব হবে না।

নীতিশ অসহায় চোখে শীতেশের দিকে তাকালো। শীতেশ সরস্বতীর পাশেই বসে ছিল। নিচু হবার উদ্যোগ করে বললো, তোমার পায়ে ধরছি বৌদি—

সরস্বতী সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল ভুলে, শীতেশের কাছ থেকে ছিটকে খানিকটা সরে গেল। বলে উঠলো, দোহাই ঠাকুরপো, পায়ে ধোরো না। তোমাদের যা ইচ্ছে হয় খাও।

নীতিশ সঙ্গে সঙ্গে শীতেশকে ধমক দিয়ে বললো, তুই একটা যাচ্ছেতাই। জানিস ওর পায়ে ভীষণ সুড়সুড়ি, তবু সেই পায়ে ধরতে যাচ্ছিস।

বলেই সে মুখ ফিরিয়ে ডাক দিলো, বেয়ারা।

বেয়ারার পরিবর্তে, স্যুটেড বুটেড স্টুয়ার্ড এগিয়ে এলো। নীতিশ প্রথমে বীয়রের অর্ডার দিলো। তারপর সরস্বতীর সঙ্গে পরামর্শ করে, খাবারের কথা বললো। খেতে খেতেই, সরস্বতী প্রথম কথাটা তুললো। নীতিশকে লক্ষ্য করেই বললো, এবার তো ঠাকুরপোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

নীতিশ বললো, নিশ্চয়ই। কাল বাবাকে চাকরির খবর জানিয়ে দিই। তারপরে দেখা যাক। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।

সরস্বতী শীতেশের দিকে তাকালো। শীতেশ তখন দু'হাত দিয়ে, মুরগীর ঠ্যাং টান করে ধরে, মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। খেতে-খেতেই, সরস্বতীর দিকে আড় চোখে তাকালো। তারপরে বললো, তবে বাগবাজারের দিকে যেও না বৌদি।

সরস্বতী বললো, তার মানে আমার পিসতুতো বোনকে তোমার পছন্দ না?

সরস্বতীর এক পিসেমশাই থাকেন বাগবাজারে। শীতেশ বললো, না, তা বলছি না। তোমার পিসতুতো বোন, মানে কপিলার কথা বলছি—।

কপিলা? সরস্বতী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কপিলা আবার কে?

তোমার পিসতুতো বোনের নাম কপিলা না?

মোটেই না। ওরকম একটা বাজে নাম হতে যাবে কেন। ওর নাম মঞ্জুলা।

ও, হাঁা হ্যাঁ মঞ্জুলা, ভুলেই গেছলাম।

নীতিশ বলে উঠলো, মঞ্জু ইজ এ গুড গার্ল, তবে—।

সরস্বতী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, বেথুন থেকে বি এ পাস করেছে এ-বছর। দেখতে শুনতেও বেশ সুন্দর।

নীতিশ বললো, তোমার মতো না।

তুমি চুপ করো। আমি একেবারে তিলোত্তমা নই।

শীতেশ বললো, তা ঠিক, তবে উর্মিলা তোমার ধারে কাছেও

আসে না।

সরস্বতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, উর্মিলা আবার কে?

তোমার পিসতুতো বোন?

সরস্বতী ওর কাজল টানা আয়ত চোখে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শীতেশের দিকে তাকালো। বললো, দেখি, তোমার চোখ দেখি।

শীতেশ ওর বড় বড় লাল চোখে সরস্বতীর দিকে তাকালো। ওকে এখন বোকাও বলা যায়, আবার ভয়ংকরও বলা যায়। গম্ভীর মুখ, চোখ লাল।

সরস্বতী ঘাড় দুলিয়ে বললো, হুঁ, বুঝেছি।

নীতিশ হো হো হেসে উঠে বললো, রাসকেল্‌টা এক বোতল বীয়র খেয়েই মাতাল হয়ে গেছে।

সরস্বতী নীতিশের দিকেও তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। নীতিশের চোখও একরকমই লাল। তার মুখও লাল দেখাচ্ছে। হাসিটাও একটু বেশি প্রগল্‌ভ এবং উচ্চকিত। সরস্বতী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, কে যে কাকে মাতাল বলছে, জানি না। দুজনেরই তো দেখছি সমান অবস্থা।

নীতিশ আরে শীতেশ দুজনে চোখাচোখি করলো। তারপরে হঠাৎ দুজনেই হাসতে লাগলো। সরস্বতী আশে পাশে দেখলো। কেউ ওদের দেখছে কি না। দুজনের দিকে চোখ পাকিয়ে বললো, তোমরা হাসি থামাবে? না কি আমি চলে যাবো?

নীতিশ সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিলো, এই ফোঁচা, চুপ করবি?

শীতেশ হাসি দমন করলো। দুজনেই গম্ভীর হয়ে খাবার খেতে লাগলো। একটু পরেই নীতিশ আবার বললো, না, আমার হাসি পাচ্ছে ফোঁচার মেমারি দেখে। শর্মিলাকে কি বলে তুই উর্মিলা বললি? তার আগে আবার কপিলা বলেছিলি। ছি-ছি-ছি, একটা মেয়ের নাম মনে রাখতে পারিস না?

সরস্বতীর খাওয়া প্রায় বন্ধ। ছুরি চামচ ওর হাতেই ধরা আছে। নীতিশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, শর্মিলাটা আবার কে?

নীতিশ বললো, কেন, আমার পিসতুতো শালী?

তোমার পিসতুতো শালীর নাম শর্মিলা। নিজের শালীর নামটাও মনে করতে পারছ না? আবার বলছিলে, বীয়রে নেশা হয় না?

নীতিশ খুব অসহায় ভাবে শীতেশের দিকে তাকালো। শীতেশ বোধহয় পরিস্থিতিটা ভালো বুঝলো না। ও মাথা নিচু করে খেতে লাগলো। নীতিশ বললো, নামটা হয় তো ভুল বলেছি, কিন্তু নেশা সত্যি হয়নি। যাই হোক, যে কথা হচ্ছিলো। ফোঁচার সঙ্গে তোমার পিসতুতো বোনের বিয়ের ব্যাপারটা পরে ভেবে দেখা যাবে। তবে আমার মনে হয়, ফোঁচার একটু মডার্ণ মেয়ে দরকার।

সরস্বতীর রুষ্টভাব কথঞ্চিৎ হাল্‌কা হলো। খাবার খেতে খেতে বললো, কেন, মঞ্জুলা কি মডার্ণ মেয়ে না? বেশ স্মার্ট, ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পারে। বরং সেই তুলনায় আমিই গাঁইয়া।

শীতেশ এবার বললো, তোমার বোনের সবই ভালো। দেখতে ভালো, স্মার্ট, কিন্তু আমার যেন কেমন ভয় ভয় লাগে—

ভয়?

হ্যাঁ। বড্ড রোখ করে কথা বলে, কটমট করে তাকায়। মানে—মানে—

নীতিশ বলে উঠলো, মানে শী ইজ এ ডমিনেটিং গার্ল।

সরস্বতী বললো, তোমাদের মতো ছেলেদের জন্য, ডমিনেটিং বৌ-ই চাই। তা না হলে তোমাদের সযুত রাখা যাবে না।

নীতিশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তা অবিশ্যি ঠিক।

কথাটা সে এমন নিরীহ ভাবে বললো, সরস্বতী ঠোঁট টিপে না হেসে পারলো না।

শীতেশ খেতে খেতেই বললো, ডমিনেটিং হলেও তেমন কিছু যায় আসে না, পোষ মানা থাকতে ভালোই লাগে। কিন্তু রামগরুড়ের ছানা বড় খারাপ।

সরস্বতী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, তার মানে?

তোমার পিসতুতো বোন মৃদুলা—।

মৃত্লা না, মঞ্জুলা। সরস্বতী এবার ধমকে উঠলো।

শীতেশ মুখের ভিতর থেকে একটি মুরগীর হাড় টেনে বের করে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ মঞ্জুলা। মঞ্জুলা মঞ্জুলা মঞ্জুলা—।

নীতিশ বললো, আবার বল্, মঞ্জুলা মঞ্জুলা মঞ্জুলা···।

মঞ্জুলা মঞ্জুলা মঞ্জুলা মঞ্জু—।

চুপ করবে? সরস্বতী ধমক দিয়ে উঠলো, কী বলছিলে বলো। রামগরুড়ের ছানা বলছিলে কেন?

শীতেশ বললো, তোমার বোনটি হাসতে জানে না।

মিথ্যুক! মঞ্জুলা ছ্যাবলা প্রকৃতির মেয়ে না যে যখন তখন হ্যা হ্যা করে হাসবে। হাসবার ব্যাপার হলে ও ঠিকই হাসে। আমি কি যখন তখন হাসি?

নীতিশ বলে উঠলো, মাথা খারাপ! তোমার হাসি এত সহজ না।

সরস্বতী ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ চোখে নীতিশের দিকে তাকালো। নীতিশ তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে, বড় এক টুকরো নান্ ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে গাল ফুলিয়ে চিবোতে লাগলো। সরস্বতীও মুরগীর ঠ্যাং তুলে নিয়ে বললো, আমার পেছনে লাগা হচ্ছে। চলো বাড়ি চলো, তারপর বোঝাব। বলে মাংসে কামড় বসালো।

নীতিশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, এই দেখ, আমাকে ভুল বুঝছ কেন। আমি খারাপ ভেবে কিছু বলিনি।

সরস্বতী সে কথার কোনো জবাব দিলো না। নির্বিকার মুখে মাংসের স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলো। সকলেই চুপচাপ খেতে লাগলো। সরস্বতীর মুখ দেখে বোঝা গেল, আপাতত ও আর ওর বোনের সঙ্গে শীতেশের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে চায় না। তবে সংকল্প থেকে যে বিচ্যুত হয়নি, তাও বোঝা যায়।

খাওয়া শেষে নীতিশ বললো, ফোঁচা তোকে কিন্তু কাল ভোরের গাড়িতে বেরোতে হবে। হেড অফিস থেকে টেলিফোনে খবর চলে গেছে। তুই কিন্তু টাইম্‌লি হাজির হবি। কাগজপত্র সাবধানে রেখেছিস তো?

শীতেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন অসহায় ভাবে বললো, তা রেখেছি।

পরের দিন ভোর ছটা বেজে দশ মিনিট। স্থান মফঃস্বল শহরের একটি শিল্পাঞ্চল। শীতেশ হাতে একটি ছোট অ্যাটাচি ব্যাগ নিয়ে, রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে, রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে নতুন জায়গা, আগে কখনো আসেনি। রাস্তার ধার ঘেঁষে সারি সারি সাইকেল রিক্‌শা। অন্য দিকে নানা রকমের দোকানপাট। দু-একটা হোটেলও দেখা যাচ্ছে। শীতেশ আদতে মফঃস্বলের ছেলে। উত্তরবঙ্গে জন্ম, সেখানেই মানুষ। এ সব হোটেলের অন্দর বাইরের চেহারা ওর জানা আছে এবং চাকরিটা যা-ই পেয়ে থাক্, এসব হোটেলে খেতে ওর কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু এরকম ঘিঞ্জি শিল্পাঞ্চল শহরের সঙ্গে ওর তেমন পরিচয় নেই। সেই হিসাবে ওর দৌড় উল্টোডাঙা দমদম পর্যন্ত।

স্টেশনের সামনে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম সমস্যা দেখা দিলো, কোন্ দিকে যাবে? উত্তরে না দক্ষিণে এবং ওর গন্তব্য কতদূর। সেই হিসাব করেই ওকে একটা রিক্‌শা ভাড়া করতে হবে। অনুমান করে নেওয়া যায়, রিক্‌শাওয়ালারাই তাকে বলে দিতে পারবে, শীতেশের গন্তব্য জুটমিলটা কোন্ দিকে ও কত দূরে।

এই ভেবে ও যখন রিক্‌শাওয়ালাদের দিকে ফিরতে যাবে, তখনই দেখলো, ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটি মানুষ। ঢলঢলে ময়লা খাকি হাফ প্যান্ট। বিবর্ণ বুক খোলা ময়লা জামাটার রঙ যে কী, তা বোঝবার উপায় নেই। খালি পা, কুচকুচে কালো, মাথায় ছোট ছোট চুল, চিবুকে এক গুচ্ছ পাতলা দাড়ি। লোকটির বয়স বেশি না এবং আপাত-দৃষ্টিতে তাকে নিরীহ দেখালেও, শীতেশ দেখলো, লোকটির দুই চোখ রক্তবর্ণ। সেই রক্তচোখে সে শীতেশের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

শীতেশ ব্যাপারটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই, লোকটা ওর মুখের সামনে তর্জনী তুলে রীতিমত শাসিয়ে বলে উঠলো, ভেবেছিস টাকা মেরে পালাবি? লোকের কাছে বলে বেড়াবি, আমার ছেলে মুতে

মুতে খাটের গদী ভিজিয়ে সব টাকা পচিয়ে দিয়েছে? শালা বানচোত, টাকা মারবি, বৌ নিয়ে পালাবি··· ।

শীতেশের কান তখন ঝাঁ ঝাঁ করতে আরম্ভ করেছে। লোকটার বাকী কথা তার কানেই ঢুকলো না। ভয় বিস্ময় আর উদ্বেগ নিয়ে ও আশেপাশে তাকালো। পাশেই যে লোকটি রাস্তার ধারে পত্রপত্রিকা বিক্রী করছে, সে একবার ফিরেও দেখছে না বা শুনছে না। এমন কি, যারা পত্রপত্রিকা দেখছে, আশপাশ দিয়ে যাতায়াত করছে, এদিকে ওদিকে দোকানদারেরা বা রিকৃশাওয়ালারা কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না। শীতেশের গলায় স্বর নেই, তবু ও কোনোরকমে জিজ্ঞেস করলো, মা-মা-মানে? আমি আপনার টাকা আর বৌ—।

চোপ, চোপরাও শালা শুয়ারকা বাচ্চা। বলেই লোকটা মারলো এক লাফ, কিন্তু শীতেশের ঘাড়ের ওপর না পড়ে, ছিটকে পড়লো রাস্তার মাঝখানে এবং সেখান থেকে হাত তুলে চিৎকার করতে লাগলো, আমি ছেড়ে দেবো না, শালা বলে কী না, আমার ছেলে মুতে মুতে···।

চিৎকার শেষ হলো না, হঠাৎ কোথা থেকে ছলাৎ করে খানিকটা জল লোকটার গায়ে মাথায় এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মারলো দৌড়। চোখের নিমেষে উধাও। শীতেশের বুকটা রীতিমত টিপটিপ করছিল। পরমুহূর্তে ও যখন প্রায় সাব্যস্ত করে উঠেছে, লোকটা পাগল, তখনই সমবেত গলায় চিৎকার শোনা গেল, মারলো মারলো, সরে যাও সরে যাও··· ।

শীতেশ চমকে তাকিয়ে দেখলো, যমদূতের মতো কালো রঙের ভয়ংকর দর্শন একটা ষাঁড় দক্ষিণ দিক থেকে দৌড়ে আসছে, আর এক দল লোক ছুটছে আর চিৎকার করছে। রাস্তার লোক আশপাশের দোকানে বা স্টেশনের উঁচু চত্বরে ঢুকে পড়ছে। শীতেশও ছুটবে কী না ভাবছে, ঠিক তখনই ওর পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক হাসতে হাসতে বললো ষাঁড়টা ছুটছে একটা গাইয়ের পেছনে, আর বুদ্ধু লোকগুলো ছুটে মরছে। বে-আক্কেলে আর কাকে বলে।

শীতেশ দেখলো, কথাটা সত্যি। একটি পুষ্ট বকনা গাভী তীরবেগে

ছুটছে, ষাঁড়টা ছুটছে তাকে তাড়া করে। ইতিমধ্যে লোকজনেরা সবাই হা হা হো হো হাসি শুরু করে দিয়েছে। কে একজন চিৎকার করে, তুজন ফিল্ম স্টারের নাম করে বললো, শালা প্রেমের সিন হচ্ছে, অমুক ছুটছে অমুকের পেছনে।

ঠিক এ সময়েই আর এক কাণ্ড। চশমা চোখে, নেংটি পরা, খালি গা একটা বুড়ো, হাতে একটা কিসের চারা গাছ। পায়ে আবার ঘুঙুর বাঁধা। ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে চলেছে, লুট পড়ছে লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা।...

শীতেশের শিরদাঁড়ার কাছটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো, গায়ের মধ্যে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠলো। ও কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছে! ঠিক জায়গায় এসেছে তো? না কি একটা ক্ষ্যাপা পাগলের শহরে এসে দাঁড়িয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই, এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু সকলেই নির্বিকার। যে যার কাজ করছে, চলছে, যানবাহন ছুটছে। আর কালক্ষেপ না করে, ও রিক্শাওয়ালাদের কাছে গিয়ে জুটমিলের নাম বলে জিজ্ঞেস করলো, যাবে কী না। তিন চারজন রিক্শাওয়ালা একসঙ্গে প্রায় ওর গায়ের ওপর রিক্শা ঠেলে নিয়ে এলো। সবাই একসঙ্গে ওকে তাদের রিক্শায় উঠতে বললো। আর এক বিপদ। ও কোনটায় উঠবে, ঠিক করার আগেই, এক ছোকরা রিক্শাওয়ালা প্রায় ধমক দিয়ে বললো, কী হলো দাদা, উঠুন না এটায়।

শীতেশ বিনাবাক্যে ছোকরার রিক্শায় উঠে বসলো। বলতে গেলে ভয়ে ভয়েই। এখানকার ধরন ধারণ চারিত্রিক লক্ষণ যে কী কিছুই বুঝতে পারছে না। যদিও গোলমাল কিছুই হলো না। রিক্শাওয়ালা ওকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো। স্টেশনের কাছ থেকে দূরে যেতে ভিড় কমে গেল, রাস্তাও ফাঁকা। শীতেশ যেন একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেললো।

মিলের গেটে রিক্শাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেট দিয়ে ঢোকবার মুখে দারোয়ান ওকে জিজ্ঞেস করলো, কহাঁ যায়েগা বাবু?

শীতেশ বললো, ম্যানেজার চৌধুরী সাবকো পাশ্।

চৌধুরী সাহেবের নামটা শুনে গালপাট্টা গোঁফওয়ালা দারোয়ানের মুখে একটু সম্ভ্রমের অভিব্যক্তি দেখা গেল। সে হাত তুলে দেখিয়ে বললো, আপ্ পহ্লে লিবার অফিসমে যাইয়ে।

শীতেশ দেখলো খানিকটা দূরেই ছোট একটি একতলা বিল্ডিং, তার দেওয়ালে লেখা 'লেবার অফিস'। ও সেদিকেই এগিয়ে গেল। বারান্দায় উঠে কোন্ ঘরে যাবে স্থির করতে পারলো না। মনে মনে স্থির করলো লেবার অফিসারের সঙ্গে দেখা করাই বোধহয় উচিত। তিনিই ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। ও অফিসের মধ্যে ঢুকলো। বাবুরা (চটকলের কেরানীদের বাবু বলা হয়, এ অভিজ্ঞতা ওর উল্টোডাঙার মিলেই হয়েছে) কেউ কেউ কাজ করছে, কেউ কেউ গল্প করছে, কেউ বা কাউণ্টারের মতো জানালা দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলছে। শীতেশ যে বাবুটিকে সামনে পেল, তাকেই জিজ্ঞস করলো. লেবার অফিসারের ঘর কোন্টা বলতে পারেন?

বাবুটি ড্যাবডেবে ভাবলেশহীন চোখে শীতেশের দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করলো। কলম চালাতে চালাতেই গম্ভীরস্বরে বললো, লেবার অফিসে কাজ করি আর লেবার সাহেবের ঘরটা কোথায় বলতে পারব না? বলে বাবুটি এমন চুপচাপ নিজের কাজ করে যেতে লাগলো, মনে হলো, শীতেশের কথা সে ভুলেই গিয়েছে। ও যখন হতাশ হয়ে অন্য কারো দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, তখন বাবটির গলা শোনা গেল, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবেন লেবার অফিসারের ঘরটা কোথায়। তা লেবার অফিসারের কাছে কী দরকার জানতে পারি?

বাবুটি কিন্তু মুখ না তুলেই কথাগুলো বললো। শীতেশ মনে মনে একটু ঋজু হবার চেষ্টা করলো। বললো, সেটা লেবার অফিসারকেই বলতে চাই।

বাবুটি এবার মুখ তুলে তাকালো, ড্যাবডেবে চোখের দৃষ্টি তেমনি ভাবলেশহীন। লোকটা নেশা ভাং করে কী না শীতেশ বুঝতে পারলো না। বেশ কয়েক সেকেণ্ড ঠায় শীতেশের দিকে তাকিয়ে থেকে কলম উঁচিয়ে সামনে দেখিয়ে বললো, সোজা গিয়ে বাঁদিকে যে কাঠের

পার্টিশন, ওটাই লেবার অফিসারের ঘর।

শীতেশ বললো, ধন্যবাদ।

অ্যাঁ? বাবুটি যেন অবাক হলো।

শীতেশ পা বাড়াতে গিয়ে আবার বললো, ধন্যবাদ আপনাকে।

হুম্! বাবুটি মাথা নিচু করে কাজ আরম্ভ করলো।

শীতেশ মনে মনে বললো, স্যাম্পেল যা সব দেখছি কপালে কী আছে কে জানে। ও কাঠের পার্টিশন দেওয়া ঘরটার কাছে এসে দেখতে পেলো, বন্ধ দরজার সামনে লেখা আছে 'লেবার অফিসার'। দরজার সামনে কোনো বেয়ারা নেই। ও দরজায় ঠুকঠুক শব্দ করতে ভিতর থেকে মোটা স্বর শোনা গেল, কাম ইন্।

শীতেশ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, সামনেই বড় টেবিল। টেবিলের ওপারে যিনি আসীন, তিনি মধ্যবয়সী বিপুলায়তন ব্যক্তি। ফরসা রঙ, মাথাব চুল ধূসর, কিন্তু গোঁফজোড়া কুচকুচে কালো, চুলে আর গোঁফে কী করে এরকম রঙ বদল হয়, শীতেশের মাথায় এলো না। মাথায় অবিশ্যি একটা টাকের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাদা ট্রাউজার প্রায় বুকের নিচেই বেল্ট দিয়ে বাঁধা। হাফশার্টের হাতা কনুই ছাড়িয়ে নেমেছে, তার ফাঁক দিয়ে মাদুলি উঁকি দিচ্ছে। চোখে চশমা, তিনিও কাজে ব্যস্ত, তবু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

শীতেশ বললো, ম্যানেজার মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

মোটা স্বর গমগমিয়ে উঠলো, তা আমার কাছে কেন। ম্যানেজার তো জেনারেল অফিসে বসেন।

শীতেশ বিনীতভাবে বললো, আমি নতুন এসেছি কী না। দারোয়ান আমাকে এখানেই পাঠিয়ে দিলো।

লেবার অফিসার গোঁফে আঙুল বুলিয়ে বললেন, দারোয়ান বুঝতে পেরেছে, আপনি নিশ্চয়ই চাকরির খোঁজে এসেছেন, সেইজন্যই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শীতেশ বললো, তা একরকম ঠিকই বুঝেছে আমি চাকরির ব্যাপারেই এসেছি।

লেবার অফিসার ঘাড় নেড়ে ভারিক্কি চালে বললেন, ওসব আর আমাকে বোঝাতে হবে না। তবে নো হোপ।

নো হোপ?

হ্যাঁ, নো ভ্যাকান্সি, তা বাপু তোমার যত কোয়ালিফিকেশনই থাক। আমি লেবার অফিসার, সব জানি, আমার হাত দিয়েই যা হবার হয়। ম্যানেজারের কাছে আর যেতে হবে না, এখান থেকেই বিদায় নিতে পারো।

ভদ্রলোক এক কথায় তুমি বলে সম্বোধন করলেন এবং বলতে গেলে সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। শীতেশ তাড়াতাড়ি অ্যাটাচি থেকে ওর নিয়োগ-পত্রটি বের করতে করতে বললো, কিন্তু শুনুন, আপনি যা ভাবছেন—।

লেবার অফিসার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, আরে ওসব সার্টিফিকেট-টিকেট কিছু হবে না। এম এ, বি এ, পাস ছেলেরা লেবারের কাজের জন্য ধন্না দিচ্ছে, তাতেই কিছু হচ্ছে না। ওসব দেখে আমি কী করব?

শীতেশ ওর নিয়োগপত্রটি এগিয়ে দিয়ে বললো, কিন্তু এটা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার?

লেবার অফিসার মোটা মোটা আঙুল বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন, পড়লেন, তারপরে যেন আকাশ থেকে পড়েছেন, এমনিভাবে শীতেশের দিকে তাকিয়ে, প্রায় হাউমাউ করে বলে উঠলেন, আরে মশাই বলবেন তো। বসুন বসুন। আপনি মিঃ রায়—মানে আপনিই শীতেশ রায়?

শীতেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আরে, আজ্ঞে ইজ্ঞে কী সব বলছেন। বসুন বসুন, দেখুন তো, আপনাকে কী না তুমি করে বলে ফেললাম? ছি ছি ছি।

শীতেশ বললো, তাতে কী হয়েছে। আপনি শত হলেও—।

বয়সে বড়, না ? হা হা, ঠিক ঠিক, কিন্তু এসব কী আজকাল কেউ মানে ? আপনার মতো এরকম বিনীত শিক্ষিত মার্জিত···আরো কিছু বলতে চাইছেন, কথা যোগাচ্ছে না বলে, গোটা শরীর নাচিয়ে নাচিয়ে, গোঁফে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে, আবার হঠাৎ বললেন, আর এমন শ্রীমান, রূপবান—আপনি তো একেবারে ছেলেমানুষ। এরকম একটা চাকরি পেয়েছেন, যা তা ছেলে কি এসব পায় ? বাহ্, ব্রিলিয়াণ্ট! রায় ? রায় মানে কী ? আপনারা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ না বৈদ্য ?

শীতেশ বুঝতে পারলো না, হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন এলো। বললো, ব্রাহ্মণ।

বাহ্ বাহ্ বাহ্! তা রাঢ়ি না বারেন্দ্র না বৈদিক ?

শীতেশ আরো অবাক হয়ে বললো, রাঢ়ি!

চমৎকার, চমৎকার! রাঢ়ির শ্রেণী না হলে আর কী এমন ছেলে হয় ? তা কী গোত্র আপনাদের ?

ধান ভানতে শিবের গীত। ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নেই, কেবল জাত বংশের নাড়ি নক্ষত্র সন্ধান ? শীতেশ বললো, কাশ্যপ গোত্র।

কাশ্যপ! লেবার অফিসার লুফে নিয়ে বললেন, গুড গুড, কাশ্যপ। হতেই হবে, হতেই হবে। ভারি ভালো লাগলো আপনাকে দেখে। ভগবান আপনার ভালো করুন। অবিশ্যি ইতিমধ্যেই করেছেন। হ্যাঁ আমার নাম ডি. আর. ঘোষাল, মানে দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল, আমিও মানে—।

শীতেশ এবার মরিয়া হয়ে বলে উঠলো, আমাকে সাতটার মধ্যে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

ডি. আর. ঘোষাল প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, আরে ছি ছি ছি, দেখেছেন, ভুলেই গেছি। তোমাকে—মানে থুড়ি, আপনাকে এতই ভালো লেগেছে যে—।

বলতে বলতেই ঘোষাল টেলিফোনের রিসিভার তুললেন, কিন্তু মুগ্ধ দৃষ্টি শীতেশের দিকে। রিসিভারে মুখ রেখে বললেন, ম্যানেজার

সাহেবকে দাও।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই বললেন, গুডমর্নিং স্যার, ঘোষাল বলছি স্যার। কলকাতা থেকে মিঃ এস. কে. রায়, নিউলি অ্যাপয়েন্টেড ওভারসিয়ার আমার এখানে বসে আছেন।·· হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এক্ষুণি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। না স্যার, উনি তো কিছু জানেন না. দারোয়ান ওঁকে আমার ঘরে—আচ্ছা আচ্ছা স্যার, যাচ্ছেন —হ্যাঁ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রিসিভার রেখেই বললেন, উনি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন।

বলতে বলতে ঘোষাল তাঁর বিপুল শরীর নিয়ে উঠলেন। টেবিল ঘুরে দরজার কাছে এগিয়ে, দরজা খুলে ডাকলেন, চিত্তবাবু, এদিকে আসুন।

একটি অতি আপ্যায়িত গলা শোনা গেল, যাই স্যার।

বলতে বলতে যে এলো, শীতেশ দেখলো সেই লোক, যে তাকে লেবার অফিসারের ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল। ঘোষাল খানিকটা হুকুমের স্বরে বললেন, এই ভদ্রলোক, ইনি মিঃ রায়, নতুন ওভারসিয়ার ব্যাচিং ডিপার্টমেণ্টের, ওঁকে জেনারেল অফিসে ম্যানেজারের চেম্বারে নিয়ে যান। ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আপনি চলে আসবেন।

চিত্তবাবু নামক বাবুটির চোখের দৃষ্টি এখন আর ভাবলেশহীন না। শীতেশের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললো, আসুন স্যার।

স্যার! শীতেশ ওর জীবনে বোধহয় এই প্রথম শুনলো! ঘোষাল শীতেশের কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে বললেন, আচ্ছা মিঃ রায়, পরে আবার দেখা হবে। রোজই হবে, অ্যাঁ? কিছু ভাববেন না, আপনার সুবিধা অসুবিধা সব আমি দেখবো।

শীতেশ হেসে বললো, আচ্ছা এখন যাই।

মনে মনে বললো, পাগল। এবার দেখা গেল, লেবার অফিসারের বাবুবৃন্দ শীতেশের দিকে একটু অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছে। অফিসের বাইরে এসে চিত্তবাবু বললো, আমি তখন বুঝতেই

পারিনি যে আপনি—

শীতেশ বললো, তা তো বটেই, কী করে আর বুঝবেন।

চিত্তবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাবেকি ধরনের সার্টের নিচে ধুতি পরা। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো, কোয়ার্টার পেয়েছেন ?

শীতেশ বললো, না।

তা হলে তো এখানে থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতা থেকে রোজ এসে তো ডিউটি করতে পারবেন না।

শীতেশ বললো, তা-ই তো ভাবছি।

চিত্তবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, ভাবতে হবে না, ভাবতে হবে না। আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেবো। মিলের কাছেই পাড়ার মধ্যে স্টাফদের একটা মেস আছে। কিন্তু আপনি তো সেখানে থাকতে পারবেন না।

কেন ?

ওটা হলো গিয়ে বাবুদের মেস, মানে আমাদের ক্লাসের লোকের। ওভারসিয়ার অফিসারেরা ওখানে থাকতে পারেন না।

অসুবিধাটা কী ?

চিত্তবাবু হাসলো। তার শাদা ঝকঝক দাঁত যে বাঁধানো, তা দেখলেই বোঝা যায়। বললো, কী যে বলেন। বাবুদের সঙ্গে আপনি থাকতে পারবেন কেন। বাবুরাও সাহেবদের সঙ্গে থাকতে পারে না।

সাহেব ! শীতেশ তা হলে এখন সাহেব। কারখানার বড় বড় ডিপার্টমেণ্টগুলো এখন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। লাইনের ওপর দিয়ে ট্রলিতে করে বড় বড় পাটের গাঁট কুলিরা ঠেলে নিয়ে চলেছে।

চিত্তবাবু চোরা চোখে কয়েকবার শীতেশকে দেখে নিয়ে বললো, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার ক'জন ?

শীতেশ অবাক হয়ে বললো, ফ্যামিলি মেম্বার ? আপাতত আমি একজনই।

ওহ্ স্যার, তাহলে এখনো বিয়ে করেননি? অবিশ্যি দেখে তাই মনে হয়, একেবারেই ছেলেমানুষ।

শীতেশ একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। ছেলেমানুষ! এসব বলার মানে কী? এর পরে হয়তো বলবে দুধের শিশু। চিত্তবাবু কিন্তু বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খানিকটা নিজের মনেই বলল, পেয়িং-গেস্ট হিসাবে যে থাকবেন, সে রকম ভালো—মানে আপনার উপযুক্ত ফ্যামিলিও এসব জায়গায় পাওয়া শক্ত। যারা আছে, তারা আবার বড্ড নাক উঁচু, তারা পেয়িং-গেস্ট রাখতে চাইবে না। তা স্যার আপনি কি ব্রাহ্মণ?

সবাই এক কথা জিজ্ঞেস করে। শীতেশ বললো, হ্যাঁ।

কোন্ শ্রেণীর বলুন তো?

শীতেশের ডি. আর. ঘোষালের কথা মনে পড়লো। বললো, রাঢ়িয় শ্রেণী।

চিত্তবাবু একগাল হেসে বললো, আমিও তা-ই। আচ্ছা, আমি দেখবো যদি সে-রকম ফ্যামিলি পাই, যারা পেয়িং-গেস্ট রাখতে পারে, অবিশ্যি যদি আপনার উপযুক্ত হয়।

শীতেশ বললো, মিলের কাছাকাছি ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায় না?

চিত্তবাবু ব্যস্ত হয়ে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও পেতে পারেন। আমিই খুঁজে দেবো। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমার নিজের আত্মীয়ের অনেক বাড়ি আছে। একেবারে নতুন বাড়ি, মোজেকের মেঝে, বাথরুম দেখলে শালা—।

চিত্তবাবু হঠাৎ থেমে গেল। শালা শব্দটা উচ্চারণ করে নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে জেনারেল অফিসের সামনে দুজনে এসে দাঁড়ালো। বারান্দায় উঠে, লম্বা বারান্দার একদিকের প্রান্তে গিয়ে, একটি বন্ধ দরজার সামনে দেখা গেল টুলের ওপর বেয়ারা বসে আছে। চিত্তবাবু বললো, ম্যানেজার সাহেবকে গিয়ে বলো, লেবার সাহেবের কাছ থেকে, এক সাহেব এসেছেন।

বেয়ারা শীতেশকে একবার দেখে ভিতরে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বললো, অন্দর যাইয়ে।

চিত্তবাবু শীতেশকে বললো, আপনি যান স্যার। পরে আবার দেখা হবে। তবে আপনার বাড়ির ব্যবস্থা আমিই করবো, ওটা আর কাউকে বলবেন না।

আচ্ছা। শীতেশ ভিতরে ঢুকলো।

বেশ বড় কামরা, মেঝেতে ম্যাট বিছানো। টেবিল ঘিরে সারি সারি চেয়ার। ম্যানেজার চৌধুরির চেয়ারটি রিভলভিং। চৌধুরির বয়স বোধহয় পঞ্চাশোর্ধে। গায়ের রঙটি কালো বললে ভুল বলা হয়, কষ্টিপাথরের মত কালো। কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। পোশাক নিতান্তই সাদাসিধে, ট্রাউজারের ওপর একরঙা হাওয়াই শার্ট। বললেন, ওয়েলকাম মিঃ রায়, বসুন।

শীতেশের এতক্ষণে মনে পড়লো, তাই বসবার আগে বললো, গুডমর্নিং স্যার।

মর্নিং মর্নিং।

শীতেশের প্রথমেই মনে হলো, চৌধুরি লোকটি শুধু গম্ভীর না, কেমন যেন রাগী রাগী। চোখের মোটা লেন্সের চশমা, কালো পাথরের মতো শক্ত মুখ দেখে তাই মনে হয়। মুখের কোথাও একটু হাসির আভাস নেই। শীতেশ তাড়াতাড়ি অ্যাটাচি খুলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং আরো কয়েকটি কাগজপত্র চৌধুরির দিকে এগিয়ে দিলো।

চৌধুরি হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন। তারপর মনোযোগ দিয়ে শীতেশের কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। এই ফাঁকে শীতেশ চোরা চোখে নিজের ঘড়িটা দেখলো, সাতটা বেজে দশ মিনিট। দশ মিনিট লেট হয়েছে ওর। সেই কারণেই কি ঘড়ি দেখলেন চৌধুরি?

চৌধুরির গলা শোনা গেল, ওরিজিন্যালি জলপাইগুড়ির

অধিবাসী আপনারা ?

শীতেশ ব্যস্তভাবে বললো, হ্যাঁ স্যার।

কলকাতায় বাড়ি ?

ভাড়া।

হুম্‌! চৌধুরি মুখ না তুলেই কথা বলছিলেন, চোখ কাগজপত্রের দিকে। চৌধুরি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় কি আপনার বাবা মা থাকেন ?

না, দাদা বৌদি।

দাদা কী করেন ?

শীতেশ নীতিশের চাকরির পদ বললো। চৌধুরি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ওহ্‌ হো, আপনি নীতিশের ভাই? ওকে তো আমি ভালোই চিনি। ও বোধহয় জানে না, আমি এখন এখানে আছি। গত বছরও আমি আমাদের কোম্পানির হাওড়ার একটা মিলে ছিলাম। এক সময়ে আমিও কিছুকাল কলকাতার হেড অফিসে কাজ করেছি। তখন থেকেই নীতিশকে চিনি। আমি ওর অনেক সিনিয়র। ও আমাকে দাদা বলতো।

চৌধুরি এতগুলো কথা বললেন, কিন্তু মুখে হাসির নামগন্ধ নেই। যাকে বলে, খাঁটি রামগরুড়ের ছানা। শীতেশ বললো, দাদা জানলে নিশ্চয়ই আপনাকে একটা টেলিফোন করতেন।

চৌধুরি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

চৌধুরিকে খুশি করার জন্য শীতেশ বললো, আমি আজই দাদাকে গিয়ে বলবো।

চৌধুরি কোনো জবাব দিলেন না। প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ কাটবার পরে বললেন, কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে তো আপনি কোনো কোয়ার্টার পাচ্ছেন না। কলকাতা থেকে যাতায়াত করে চাকরি করবেন কি করে ?

শীতেশ বললো, কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, কী করবো—।

ব্যবস্থা? চৌধুরি ভুরু কোঁচকালো, মুখটা যেন আরো রাগী

দেখালো। আবার বললেন, আই ডোণ্ট নো হোয়াট অ্যারেঞ্জমেন্ট ক্যান বী ডান ইন দিস ডার্টি টাউন। এমন কোনো হোটেল নেই, যেখানে ভদ্রলোক থাকতে পারে।

শীতেশ খানিকটা দ্বিধা আর সংকোচের সঙ্গে বললো, কাছাকাছি কোনো ভদ্রপল্লীতে একটা ফ্ল্যাট যদি পাওয়া যায়—।

ভদ্রপল্লী? ফ্ল্যাট? ইন দিস ডার্টি টাউন? আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এনি হাউ, দেখুন কী ব্যবস্থা হয়।

শীতেশ রীতিমত ঘাবড়ে গেলো। কিন্তু যিনি ওর দাদাকে তুমি বলেন এবং দাদা যাঁকে দাদা বলতো, তিনি ওকে আপনি করে বলছেন, কেমন যেন কানে লাগছে। ও বললো, আপনি আমার দাদাকে তুমি বলতেন। আমাকেও তাই বলবেন।

থ্যাংক্যু। নিশ্চয়ই বলবো।

চৌধুরির ঠোঁটের কোণে কি একটু হাসি দেখা গেল? বোধহয় না, ওটা শীতেশের চোখের ভুল। চৌধুরি কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, এসব আর দেখবার কিছু নেই। তোমার সব কিছুই তো হেড অফিস থেকে হয়ে গেছে। আমাদের জুট ডিরেক্টর তো দেখছি তোমার ইণ্টারভিউতে হাইলি প্লীজ্‌ড। বলে বাঁ হাতে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন, বললেন, ব্যাচিং-এর তালুকদারকে আমার ঘরে আসতে বলো। তারপরে সেনকে আমাকে রিং করতে বলো।

রিসিভার রেখে, বেল্ পুশ্ করলেন। বেয়ারা ঢুকল।

চৌধুরি বললেন, বড়া বাবুকো সালাম দো।

বেয়ারা চলে যেতে একটা ফাইল টেনে নিয়ে, সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, দুপুরে আমার সঙ্গেই লাঞ্চ করো। একটু রেস্টও নিতে পারবে।

শীতেশ কৃতজ্ঞতায় প্রায় বিগলিত হয়ে গেল, একটা কথাও বলতে পারলো না।

চৌধুরি আবার বললেন, এ চাকরির সবই ভালো, যদি স্থানীয়

লোক হওয়া যায়। নয়তো সঙ্গে সঙ্গে যদি কোয়ার্টার পাওয়া যায়। তা না হলে বড্ড অসুবিধা। দেখা যাক, কী করা যায়।

চৌধুরির চেয়ারের পিছনে হঠাৎ একটি দরজা একটু ফাঁক হলো, সরু গলা শোনা গেল, আসবো স্যার ?

আসুন।

শীতেশ বুঝতেই পারেনি, পিছনে একটা দরজা আছে। সেই দরজা খুলতেই, জেনারেল অফিসের কিছু অংশ দেখা গেল। ইনি বোধহয় বড়বাবু। সাবেকি লম্বা শার্ট, ধুতির কোচা কোমরে গোঁজা। বয়সও পঞ্চাশোর্ধ্বেই, কিন্তু চুল কুচকুচে কালো। হিটলারি গোঁফ এবং তাতে যে নস্যি লেগে আছে, তা স্পষ্টই দেখা যায়। একটু চোখ পিটপিট করা অভ্যাস আছে। এসেই একবার শীতেশকে দেখে নিলেন। চৌধুরি শীতেশকে দেখিয়ে বললেন, ইনি ব্যাচিং-এর নতুন ওভারসিয়ার। আজ থেকে জয়েন করলেন।

বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে শীতেশের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, গুডমর্নিং স্যার।

শীতেশ কোনোরকমে উচ্চারণ করলো, গুডমর্নিং।

চৌধুরি বললেন, মিঃ রায়ের এসব কাগজপত্র নিয়ে যান, ফাইল করুন। আপনাদের রেকর্ড কী সব তৈরি করতে হবে, করে ফেলুন।

বড় বাবু বললেন, করে ফেলছি স্যার।

আর শুনুন, আপনাদের এখানে ভদ্র পল্লী-টল্লী বলে কিছু আছে নাকি ?

বড়বাবু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, তা আছে স্যার। জনকপাড়া, চাটুয্যেপাড়া ।

চৌধুরি বাধা দিয়ে বললেন, সে-সব কি ভদ্রপল্লী ?

বড়বাবু বললেন, হ্যাঁ স্যার। নাম করা সব সেকালের পরিবারদের বাড়ি। বড় বড় সরকারি অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিস্তর।

চৌধুরি গম্ভীরভাবে বললেন, হুম্! একটা ভালো ফ্ল্যাট দেখে দিতে পারেন? মিঃ রায় থাকবেন। দেখবেন আবার বেশি ভাড়া-টাড়া যেন না লাগে। বছর খানেকের জন্য দরকার।

বড়বাবু কৃতার্থ হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, আজ থেকেই খোঁজ করবো স্যার।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি দেখুন। আর একটা সারভেণ্ট-কাম-কুকও বোধহয় দরকার? চৌধুরি জিজ্ঞেস করলেন শীতেশের দিকে তাকিয়ে।

শীতেশ বললো, হ্যাঁ, সেটা না হলে—।

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, সেটাও আমি আজ থেকেই দেখছি স্যার।

এ সময়েই টেলিফোন বেজে উঠলো। চৌধুরি টেলিফোন ধরলেন। একটু শুনে বললেন, হ্যাঁ, আমার কামরায় একবার আসতে পারবেন? ...আচ্ছা, তা হলে আসুন। রিসিভার রেখে দিলেন।

তারপর শীতেশের কাগজপত্র বড়বাবুকে দিয়ে বললেন, মিঃ রায়ের যদি কিছু সই-টই করার দরকার হয়, আফটার লাঞ্চ করাবেন। এগুলো নিয়ে যান।

বড়বাবু কাগজপত্র নিয়ে, পিছনের দরজা দিয়েই চলে গেলেন। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলো আর একজন। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আঁট ট্রাউজার সিল্কের হাওয়াই শার্ট। চেহারাটি মন্দ না। শ্যাম্পু করা চুল বেশ যত্ন করে আঁচড়ানো। ভাবভঙ্গি স্মার্ট। ঢুকেই বললো, ডেকেছিলেন স্যার?

চৌধুরি বললেন, হ্যাঁ তালুকদার, বসো। ইনি হলেন শীতেশ কুমার রায়, তোমার ডিপার্টমেণ্টের নতুন ওভারসিয়ার।

তালুকদার সঙ্গে সঙ্গে শীতেশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ওহ্, আপনিই মিঃ রায়? ভেরি হ্যাপি টু মীট য়ু। গতকালই স্যারের কাছে খবর পেয়েছি, আপনি আজ আসছেন।

চৌধুরি বললেন, তোমার নতুন সহযোগীকে কেমন দেখছ তালুকদার?

ফাইন স্যার। ভেরি হ্যাণ্ডসাম ইয়ংম্যান।

ওকে একটু দেখো।

নিশ্চয়ই।

আর জুটমিল জিনিসটা কী, সেটাও একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিও।

তালুকদার হাসলো, কিছু বললো না। এ সময়েই সামনের দরজা দিয়ে, আর একজন এলেন। রোগা, লম্বা, ফর্সা, চোখে চশমা, বয়স চল্লিশোর্ধে। চৌধুরি বললেন, আসুন মিঃ সেন। পরিচয় করিয়ে দিই, এ আপনাদের ব্যাচিং-এর নতুন ওভারসিয়ার এস. কে. রায়। আর শীতেশের দিকে ফিরে বললেন, মিঃ সেন, এ মিলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।

শীতেশ দাঁড়িয়ে উঠতেই, সেন হাত বাড়িয়ে শীতেশের সঙ্গে করমর্দন করলেন, বসুন বসুন। আপনি আজ জয়েন করেছেন সে খবর আগেই পেয়েছি। বলে তিনি নিজেও বসলেন। চৌধুরী বেল পুশ্ করে বেয়ারাকে চা আনতে বললেন।

শীতেশ লক্ষ্য করে দেখলো, চৌধুরী আর সেন, সমান রামগরুড়ের ছানা। কেউ হাসেন না। দুজনের মুখভাবই এমন সীরিয়স্, যেন গাম্ভীর্য রক্ষার একটা প্রতিযোগিতা রয়েছে দুজনের মধ্যে।

তারপরেই আবার সেই আশ্রয়ের কথা উঠলো। এ শহরের সমালোচনা এবং আত্মশ্রাদ্ধাদি এবং শহরময় ভূরি ভূরি অসৎ লোকদের নিয়ে আলোচনা চললো। শীতেশ যত শোনে, ততই ওর পিলে নামক বস্তুটি খাবি খেয়ে খেয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে চৌধুরি শুনিয়ে দিলেন, শীতেশের দাদার সঙ্গে তাঁর পুরনো পরিচয় ইত্যাদির কথা এবং আজ লাঞ্চে ডেকেছেন, সে কথাও। চা এলো। চা খেতে খেতেই, যেন গভীর চিন্তামগ্নতা থেকে সহসা সুপ্তোত্থিতের মতো সেন বললেন, আচ্ছা, আমাদের ডক্টর গুপ্তও তো ব্যাচেলর। ওর কোয়ার্টারে মিঃ রায়ের থাকবার ব্যবস্থা করা যায় না?

চৌধুরি তাকালেন তালুকদারের দিকে। তালুকদার যেন

অস্বস্তিতে একটু হেসে বললো, আমার মনে হয় স্যার, গুপ্তর ওখানে হবে না।

সেন জিজ্ঞেস করলেন, কেন, অসুবিধাটা কী?

চৌধুরি আরো গম্ভীর হলেন, তারপর তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে ব্যাপারটা সত্যি?

তালুকদার তেমনি হেসেই বললো, সবাই-ই তো দেখেছে স্যার, জানেও।

চৌধুরি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু বিয়েটা কি হবে?

তালুকদার বললো, তা জানি না স্যার। তবে মহিলা রোজই আসেন। অনেক রাত্রি অবধি থাকেন, ডক্টর গুপ্ত গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

সেন বলে উঠলেন, কে কে? সেই মহিলা কে?

চৌধুরি বললেন, আরে মেথলিপুর মিলের সেই ছোকরা সেল্‌স্ অফিসার মারা গেল না! তার বিধবা বৌ!

সেনের শুকনো মুখ আরো গম্ভীর হলো, বললেন, পরকীয়া প্রেম?

চৌধুরি বললেন, না, বিধবা প্রেম, এখন বিধবা বিবাহটি হলেই বাঁচি। যা-ই হোক, শীতেশের তা হলে সেখানেও হচ্ছে না। তা হলে এসব আলোচনা থাক।

শীতেশ কেমন অস্বস্তি বোধ করলো, বললো, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

চৌধুরী বললেন, হয়ে কিছুই যাবে না, করে নিতে হবে। এনি হাউ, তালুকদার, তুমি ওকে নিয়ে ডিপার্টমেণ্টে যাও। এগারোটার সময়ে আমার এখানে পৌঁছে দিয়ে যেও।

তালুকদার উঠলো, আচ্ছা স্যার। আসুন। সে শীতেশকে ডাকলো।

শীতেশ দুই গোমড়ামুখো ম্যানেজারকেই বললো, যাচ্ছি। দুজনেই ঘাড় নাড়লেন। শীতেশ তালুকদারের সঙ্গে বেরিয়ে বাইরে এলো।

বাইরে এসেই তালুকদার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বলে উঠলো, শালা, কখন থেকে নেশার জন্য প্রাণটা হাঁসফাঁস

করছে। আপনার চলে তো? বলে শীতেশের দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিলো।

সত্যি কথা বলতে কি, শীতেশের প্রাণটা তার চেয়ে বেশি হাঁসফাঁস করছিল। তালুকদারের বাচনভঙ্গিটি ওর বেশ আন্তরিক মনে হলো। বললো, চলে, কিন্তু এতক্ষণ সুযোগই পাচ্ছিলাম না।

শীতেশ একটা সিগারেট নিলো। দুজনেই সিগারেট ধরালো। তালুকদার বললো, দাঁড়ান। অফিসের সামনেই সিগারেট খেয়ে যাই। ব্লাডি চটকল শালা, যেখানে সেখানে সিগারেট খাবার উপায় নেই। সে সব খবর জানেন তো?

চটকলে কাজ শেখবার সময়, শীতেশ জানতো, সব জায়গায় সিগারেট খাওয়া যায় না। বললো, কিছু কিছু জানি। ডিপার্টমেন্টে তো একেবারেই চলে না।

তালুকদার এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, গুলি মারুন মশাই ডিপার্টমেণ্ট। আমি তো দিব্যি চালিয়ে যাই। বলবে কে? ম্যানেজার? তাঁরা-ডিপার্টমেণ্টে ঢোকবার আগেই খবর পেঁাছে যায়। তাছাড়া ছোটখাট একটা কাঠের পার্টিশন তো আছে, যেখানে বসি। লেবারারও দেখতে পায় না। খচ্চর হচ্ছে শালা সুপারভাইজারগুলো।

শীতেশ জিজ্ঞাসা করলো, কেন?

তালুকদার বললো, কারণ ওরা তো জানে, আমি আমার পার্টিশনের মধ্যে সিগারেট খাই। আর ঠিক সেই সময়েই ওরাও ভেতরে এসে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে বলবে, স্যার, তা হলে আমিও দু'টান দিয়ে যাই। কিছু বলতে পারি না। খালি বলি, খান বানচোত খান, আর ন্যাকামি করবেন না। খেয়ে কাটুন, নিজের কাজ করুনগে।

শীতেশ হেসে ফেললো।

তালুকদার আবার বললো, হাসলে হবে না ব্রাদার, আপনাকেও আলটিমেটলি তা-ই করতে হবে। বেশি ভদ্দরলোক হয়েছেন তো মরেছেন। সব সময়ে দাবড়ে চলতে হবে, তা না হলে কোনো ব্যাটাকে

সামলে রাখতে পারবেন না, কাজ আদায় করতে পারবেন না। সে লেবারার হোক, সুপারভাইজার হোক, আর বাবুই হোক। সব এক একটি ঘুঘু।

শীতেশ বললো, তা-ই নাকি?

তবে? অবিশ্যি আগেকার সাহেবরা চড় চাপড় ধাক্কা-টাক্কা মারতো। আজকাল আর ওসব চলে না। স্বাধীন দেশ, বুঝলেন তো, তাছাড়া পলিটিক্স আছে, ইউনিয়ন আছে, ওয়ার্কস্ কমিটি আছে। তবে বকে ধমকে কাজ আদায় করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার আপনার কাজ কী মশাই? সর্দারি করা। সর্দারি করে, বেশি করে কাজ আদায় করা। আর যা কিছু শিখে এসেছেন, ওসব লাটে তুলে দিন, কিছু হবে না।

শীতেশ কোনো মন্তব্য করতে পারলো না। এখনও ওর সে-রকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু যে বলছে, সে একজন অভিজ্ঞ। জিজ্ঞেস করলো, আপনার এখানে কতদিন হলো?

তালুকদার বললো, তা এক যুগ।

মানে বারো বছর?

তেরোতে পড়েছে। একটা কথা মনে রাখবেন, এটা চটকল, সব ব্যাটা খপিস। তবে আপনার ভাগ্যটা বোধ হয় ভালো। স্বয়ং চৌধুরি সাহেবের স্নেহ পেয়েছেন আপনি! বড় দুর্লভ জিনিস। কাজ ছাড়া উনি কিছু জানেন না।

শীতেশ একবার তালুকদারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। বুঝতে চাইলো তালুকদার কথাটা কী ভেবে বললো। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। হাসি বা বিদ্রূপ, কিছুই তার মুখে নেই, বরং একটা অন্যমনস্ক ভাব। শীতেশ বললো, কথায় কথায় হঠাৎ জানা গেল উনি আমার দাদাকে চেনেন, উনি যখন হেড অফিসে কিছুকাল কাজ করেছিলেন, তখন দাদাকে ভালোবাসতেন।

তালুকদার বললো, সে ভালোবাসা আপনিও পাবেন। দেখুন ভাই রায়, আমার সোজা কথা, বড় বড় কথার মারপ্যাঁচ জানি না,

আমরা সবাই আসলে কেরিয়ারিস্ট। স্নেহ ভালোবাসা যা পাবেন, সব কাজে লাগিয়ে যাবেন।

শীতেশ কথার মর্মার্থ না বুঝে জিজ্ঞেস করলো, তার মানে ? স্নেহ ভালোবাসাকে কাজে লাগাবো কী করে ?

তালুকদার মুখটা বিকৃত করে বললো, আপনি মশাই একটি রামভগুড়ে।

অ্যাঁ !

তালুকদার তাড়াতাড়ি বললো, সরি সরি, আমি ভুলেই যাচ্ছি, আপনি নতুন লোক, এইমাত্র আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আসলে একেবারে চটকলিয়া বনে গেছি তো। কিছু মনে করবেন না ভাই. আমি বলছি, চৌধুরি সাহেবের পজিশনটা এখন কী জানেন তো ? উনি শুধু ম্যানেজার নন, কোম্পানির তিনটে চটকলের উনি লেবার অ্যাডভাইসারও বটে। ওঁর মতো লোকের স্নেহ পাওয়া মানে বোঝেন ?

শীতেশ অসহায়ের মতো ঘাড় নাড়লো। তালুকদার আবার মুখটা বিকৃত করে বলে উঠলো, আপনাকে সত্যি গালাগাল দেওয়া উচিত।

শীতেশ নিরুপায় নিরীহ চোখে তালুকদারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তালুকদার গলা খাটো করে বললো, আরে মশাই. চৌধুরির এক কথায় আপনাকে সিনিয়র গ্রেড দিয়ে দিতে পারে। চাই কি ম্যানেজেরিয়াল র‍্যাংকে তুলে দিতেও পারে। এবার বুঝলেন তো স্নেহ ভালোবাসাকে কী ভাবে কাজে লাগাতে হবে ?

নিন, এখন চলুন, ডিপার্টমেণ্টে যাই।

বলে সে সিগারেট ফেলে দিয়ে, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিলো। শীতেশও তা-ই করলো। কিন্তু তালুকদারের কথার মর্মার্থ ও স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারলো না। তবে লোকটিকে ওর ভালোই লাগলো। কেবল একটা শব্দ ওর মনে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, তা-ই না জিজ্ঞেস করে পারলো না, আচ্ছা, রামভগুড়ে মানে কী বলুন তো ?

তালুকদার অবাক তীক্ষ্ণ চোখে শীতেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস

করলো, তখন থেকে কথাটা মনে করে রেখেছেন ?

হ্যাঁ। কখনো শুনিনি কী না, তা-ই।

তালুকদারের চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। বললো, আপনি ভাই একটু সাবলাইম্ হয়ে আছেন।

শীতেশ বললো, কী ? খচ্চব ?

তালুকদারের দু'চোখ প্রায় ছানাবড়া। হঠাৎ কোনো কথা যোগালো না তার মতো স্মার্ট লোকের মুখেও।

শীতেশ বললো, এরকম একটা কথা আমার নিজের দাদাই বলেছিল কী না, তা-ই বলছি, আপনি বোধহয় তা-ই বলছেন।

তালুকদার প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললো, আপনার দাদা আপনাকে বলেছে ?

হ্যাঁ।

তালুকদার হো হো করে হেসে উঠে, শীতেশের কাঁধে চাপড় বসিয়ে দিলো, বললো, অপূর্ব ! না না, সাবলাইম্ না, আপনি গ্রেট ! কিন্তু বিলিভ মী অর নট, রামভগুড়ে মানে আমিও জানি না। চটকলে ওরকম অনেক কথা শোনা যায়, যার কোনো মানে নেই। কোনো ডিক্সনারিতেও নেই।

কথায় কথায় ওরা ডিপার্টমেণ্টে এসে পৌঁছুলো। ডিপার্টমেণ্ট একটা না, পর পর অনেকগুলো, বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিবিধ মেশিনের শব্দে, কথাবার্তা শোনা যায় না। অধিকাংশ কথাবার্তা ইশারাতেই সারতে হয়। অন্যথায় খুব কাছাকাছি হয়ে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলতে হয়।

তালুকদার চারদিকে তাকিয়ে বললো, একটা সুপারভাইজারকেও দেখতে পাচ্ছি না ! সব আড্ডা মারতে চলে গেছে। বসবেন, না ঘুরে দেখবেন ?

শীতেশ বললো, চলুন, একটু ঘুরে দেখি।

আসুন।

কাছেই একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে, প্রায় নড়বড়ে চেয়ারে

একটি যুবক বসে ছিল। মাথা নিচু করে কী যেন লিখছিল। শীতেশকে নিয়ে তালুকদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই যুবক চমকে উঠে, লেখা কাগজের ওপর হাত চাপা দিল। তালুকদার বললো, বুঝেছি বুঝেছি, বৌকে চিঠি লিখছেন। ও আর চাপা দিয়ে কী হবে। ওরকম আমিও অনেক লিখেছি, কিন্তু আসলে তো ঢু ঢু।

যুবকটিকে যদিও একটু ছিমছাম দেখাচ্ছে, তবু খানিকটা রক্তশূন্য চেহারা. কোলবসা বড় বড় চোখ। শীতেশের দিকে একবার দেখে বললো, ঢু ঢু মানে?

ঢু ঢু মানে ঢু ঢু। চিঠিতে তো আর ছেলে হবে না, সোহাগ করে আদর করাও চলবে না। চিঠিতে আর হাজার গণ্ডা চুমো আদর পাঠিয়ে কী হবে?

যুবকটি সত্যি লজ্জিত হয়ে উঠলো, বললো, কী যে বলেন স্যার।

তালুকদার বললো ঠিকই বলেছি। তার চেয়ে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাববেন। কিছুটা কাজ দেবে। এখন শুনুন, ইনি কে জানেন?

যুবকটি মাথা নাড়লো। তালুকদার বললো, ইনি হলেন মিঃ এস. কে. রায়। আপনাদের ডিপার্টের নতুন ওভারসিয়ার সাহেব।

যুবকটি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, নমস্কার স্যার। আমি ডিপার্টমেন্ট ক্লার্ক।

শীতেশও কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, বসুন বসুন। আপনার নাম কী?

অমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

তালুকদার বললো, মানে এ কৃষ্ণে কোনো মল নেই। তা অমলবাবু, নতুন সাহেবকে কেমন দেখছেন?

অমল একগাল হেসে বললো, খুব ভালো স্যার।

নতুন সাহেবকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

নিশ্চয়ই স্যার।

আসুন রায়। তালুকদার শীতেশকে নিয়ে, মেশিনের দিকে এগিয়ে গেল।

শ্রমিকরা কাজ করতে করতেই তালুকদার আর শীতেশকে তাকিয়ে দেখলো। কেউ কেউ কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম জানালো। তালুকদার বিশেষ কয়েকজন শ্রমিককে শীতেশের পরিচয় দিলো। একজন ওয়ার্কস কমিটির মেম্বারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপরে হঠাৎ একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখা গেল, বছর ত্রিশ বয়সের এক যুবক, ট্রাউজার শার্ট পরা, ছ' ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটি তিন ফুট উঁচু লোহার নলের ওপরে কাঠ পেতে বসে আছে। আর একজন শ্রমিক-জাতীয় লোক তার ঘাড় আর পিঠ ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মাথার চুলেও ম্যাসেজ করে দিচ্ছে।

শীতেশ দেখলো, তালুকদারের শক্ত মুখটা রাগে ফুলে উঠেছে। ব্যাপারটা ও কিছু বুঝেই উঠতে পারছে না, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, একটা অঘটন কিছু ঘটবে। ও আশে পাশে তাকিয়ে দেখলো, কয়েকজন কার্যরত শ্রমিক মুখ টিপে টিপে হাসছে। তালুকদার বেগে সেইদিকে ধাবিত হলো এবং যে শ্রমিকটি ম্যাসেজ করছিল, তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই যে বসে ছিল, তার চুলের মুঠি জোরে টেনে ধরলো। যুবক বলে উঠলো, আরে এত জোরে টানছিস কেন কাল্লু, লাগছে যে।

তালুকদার চিৎকার করে বললো, কেবল লাগছে? শালা, আজই তোমার সুপারভাইজারি ঘুচিয়ে দিচ্ছি আমি।

যুবকটি এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে, মা কালীর মতো জিভ কেটে বললো, স্যার আপনি!

হ্যাঁ। তোমার যম।

যুবকটির চোখ বোধহয় ট্যারা, কিংবা এখন তা-ই দেখাচ্ছে এবং মিট মিট করছে। এমন অসহায় আর করুণ দেখাচ্ছে যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে। হাত জোড় করে বললো, মাইরি বলছি স্যার। এমন ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছে—।

তালুকদার মেশিনের শব্দ ছাপিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, শাট আপ!

পেঁদিয়ে তোমার খাল খিচে দেবো। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে তো ছুটি নিয়ে বৌকে দিয়ে গা হাত পা টেপাওনি কেন ?

যুবকটি তেমনিভাবেই বললো, স্যার আর একদিনও ছুটি পাওনা নেই, সব শেষ।

শীতেশের হাসি পাচ্ছিল, মনে মনে ভয়ও হচ্ছিল। তালুকদারের মতো ওভারশিয়ার ও কোনোদিন হতে পারবে না। কিন্তু সুপারভাইজার যুবকটিকে দেখে মনে হচ্ছে প্রায় সবটাই ছলনা। যেভাবে ও চোখ পিট পিট করছে, কেবল চোখে জল আনবার জন্যই যেন। তার মধ্যে আবার শীতেশকেও কয়েকবার দেখে নিয়েছে।

তালুকদার এক ভাবেই বললো, ওসব ফেরেববাজী আমি জানি। আজ নতুন দেখলাম না ? এ নিয়ে কদ্দিন হলো ?

তিনদিন স্যার।

লায়ার, ড্যাম্ লায়ার। মিনিমাম টেন ডেজ। এবার আমি চার্জশীট দেবোই। বলেই সে অন্যদিকে ফিরে চিৎকার করলো কাল্লু কঁহা গয়া, বোলাও উস্‌কো।

কয়েকজন শ্রমিক কাল্লুকে ডাকাডাকি করলো। কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কেউই মোটেই উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত না। যেন এটা একটা সামান্য ঘটনা। বরং এখনও তারা মুখ টিপে টিপে হাসছে। কাল্লু নামক শ্রমিকটি অপরাধীর মতো তালুকদারের সামনে এসে দাঁড়ালো, মুখ নিচু। তালুকদার চিৎকার করে বললো, ক্যায়া, ইধার কাম করনে আয়া না মালিশ করনে আয়া ?

কাল্লু হাত জোড় করে বললো, সাব গোস্তাকি হো গয়া।

শীতেশ অবাক হলো, লোকটি সুপারভাইজারের নামে কিছু বললো না, কেবল নিজের দোষ স্বীকার করলো। তালুকদার বললো, এ্যায়সা গোস্তাকি তুম্ বহোত দফে কিয়া। যাও, ছুট্টি করো, বাহারমে সেলুনমে যাকে কাম পাকড়ো। তুমকো ভি হম চার্জশীট দেগা।

কাল্লু হাত জোড় করেই বললো, হোজোর মাই বাপ।

তালুকদার এবার বাঙলায় বললো, হ্যাঁ, তোমার মা বাপ না হলে

আর কার হবো। আভি ভাগো মেরে সাম্‌নেসে।

কাল্লু অত্যন্ত মন্থর পায়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। এ সময়েই ঢলঢলে সাদা প্যান্ট, বোধহয় তার চেয়েও ঢলঢলে শার্ট গায়ে, নাদুস নুদুস এক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। মাথায় কাঁচা পাকা ছোট ছোট চুল। শার্টের ফাঁকে, গলার কাছে পৈতা দেখা যাচ্ছে। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখখানি দেখলে, কেমন যেন একটি বুড়ো খোকার মতো নিরীহ আর নিষ্পাপ মনে হয়। একটু বেঁটে-খাটো মানুষ। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে মিঃ তালুকদার?

তালুকদার সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলো, এই যে বাঁড়ুয্যেমশাই, কোথায় থাকেন আপনারা? আমি গেছি একটু ম্যানেজারের কাছে, আর এসে দেখছি আপনাদের কারোর কোনো পাত্তা নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের নিরীহ মুখটি আরও নিরীহ হয়ে উঠলো। বললেন, কেন কেন, আমি তো সাউথের ওই মেশিনের দিকে ছিলাম। কী হয়েছে?

তালুকদার যুবকটির দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে, বাঁড়ুয্যে-মশাইকে বললো, আপনি হলেন সিনিয়র সুপারভাইজার। অথচ কিছুই দেখেন না। ওই ইডিয়টটা কী করছিল আপনি জানেন? বলে যুবকটির দিকে আঙুল দেখালো।

বাঁড়ুয্যেমশাই যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? ওহ্, সলিল মৈত্র? কী করছিল বলুন তো? গাঁজা-টাজা খাচ্ছিল নাকি?

এবার তালুকদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, গাঁজা? ও কি গাঁজা খায় নাকি?

বাঁড়ুয্যেমশাই যেন গভীর দুঃখে বললেন, ও যে কি খায় না, তা ভগবান জানে। কী করেছে ও?

কাল্লুকে দিয়ে বাবু ম্যাসেজ করাচ্ছিলেন। ও কি আমার চাকরিটা খেতে চায়?

বাঁড়ুয্যেমশাই সলিলের দিকে ফিরে বললেন, ছি ছি ছি সলিল, দিস ইজ ইয়োর প্লেস অব ওয়ার্ক, নট ফর ম্যাসেজ। তোমাদের

বয়সে আমরা যে কী কষ্ট করে কাজ করেছি। মনে আছে সেই একবার ডিকাম্বার সাহেব আমার কর্মঠতা দেখে, এত খুশি হয়েছিলেন, কেবল যে গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন, তা-ই নয়, ওঁর কোয়ার্টারে ডিনারে ডেকে ফেললেন। তবে আমাদের সেই যুগে— তখন আবার পেট্রিয়টিজমের যুগ তো, সেইজন্য···।

তালুকদার হাত জোড় করে বললো, দোহাই বাঁড়ুয্যেমশাই, আপনি আর এখন শুরু করবেন না। এখন এই সলিল মৈত্রকে কী করা উচিত তা-ই বলুন। আমি ওকে চার্জশীট দেবো।

বাঁড়ুয্যেমশাই সলিলের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখিত স্বরে বললেন, ছি ছি ছি, এখনো দাঁড়িয়ে আছ সলিল, তোমার একটা অনুশোচনা নেই? তালুকদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রমিস—।

তিনি আর বলবার সুযোগ পেলেন না। সলিল ছুটে এসে তালুকদারের পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো, করুণ স্বরে বললো, স্যার মাপ করে দেন, দিস টাইম—।

তালুকদার সরে গিয়ে বললো, এই এই, নাটক কোরো না, দিস ইজ নট স্টেজ। আই নো য়ু আর এ গ্রেট অ্যাকটর। গেট আউট, নাউ গেট আউট অব মাই সাইট।

বাঁড়ুয্যেমশাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যাও যাও, কাজ করগে যাও। কী করিস তোরা, জীবনটাকে বুঝলি না।

সলিল প্রায় কাল্লুর মতো ভঙ্গিতেই ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছিল। তালুকদার হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকলো, শোনো, এদিকে শুনে যাও।

সলিল ফিরে এলো। তালুকদার বললো, বাঁড়ুয্যেমশাইও শুনুন, ইনি আপনাদের নতুন ওভারসিয়ার মিঃ এস. কে. রায়।

শীতেশের দিকে ফিরে বললো, এদের পরিচয় তো আপনি পেলেনই। ইনি সুখময় ব্যানার্জী—সিনিয়র সুপারভাইজার, আর হি ইজ জুনিয়র।

সলিল যেন শ্রদ্ধায় একেবারে বিগলিত হয়ে বললো, গুড মর্নিং

স্যার। আওয়ার গ্রেট ফরচুন, দ্যাট য়ু হ্যাভ কাম্।

তালুকদার বললো, গ্রেট ফরচুন তো বটেই, তা না হলে আর জ্বালিয়ে মারবে কেমন করে।

বাঁড়ুয্যেমশাই বলে উঠলেন, না না, কথা তা হচ্ছে না। আমি তখন থেকে দেখছি, এরকম সুন্দর একটি দেবশিশু এখানে কোথা থেকে এলো।

শীতেশ খুশি বা অবাক হবার পরিবর্তে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। দেবশিশু! ওকে কেউ কখনো এরকম করে বলেনি। বাঁড়ুয্যে-মশাই ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তখনো বলে চলেছেন, আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম, এ খুব সাধারণ নয়। কপালটা দেখেছেন মিঃ তালুকদার, ঠিক যেন শানশাইন, আর চোখ! দেখুন, হাউ ডীপ লুকিং। কান দুটো দেখুন, দেখলেই বোঝা যায়, এ সবই হচ্ছে সৌভাগ্যবানের চিহ্ন। সময় থাকলে এখনই একবার হাতটা—

তালুকদার বললো, প্লিজ বাঁড়ুয্যেমশাই, ও কাজটা আর এখন করবেন না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, না, এখন আর দেখবো না, পরে দেখবো। তবে আমি হলপ করে বলতে পারি, ইনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। ঠিক বলেছি কী না মিঃ রায়?

শীতেশ ইতিমধ্যেই বোকা হয়ে উঠেছিল। বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঁড়ুয্যেমশাই একটু চোখ বড় করে ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহুঁ উঁহুঁ, আজ্ঞে-টাজ্ঞে বলবেন না, আপনি হলেন ওভারসিয়ার, আমার সাহেব। কিন্তু আপনি যে প্রকৃত শ্রীমান, কুলশীল অতি উচ্চ, বয়স্ককে সম্মান দেওয়া আপনার রক্তে আছে। এখনো বোধহয় বিবাহাদি হয়নি?

শীতেশ বললো, না।

কোন্ শ্রেণী ভাই আপনি; রাঢ়িয়?

এই প্রশ্নটা কতবার যে শুনতে হলো। শীতেশ শব্দ করলো, হুঁম্! বাঁড়ুয্যেমশাই ঘাড় দুলিয়ে বললেন, এক একজনকে দেখলেই

কেমন বোঝা যায়, সে কেমন কুলশীলের ছেলে। আপনার মধ্যে ফাঁকি নেই, আপনি ফাঁকিবাজি করে কিছু শেখেননি। আপনি হচ্ছেন আমাদের মতো লোক, যারা খেটে কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। এটা যদি স্বদেশী যুগ হতো, আপনি হতেন মস্ত বড় নেতা। আমি যখন নেতাজীর সঙ্গে ছিলাম, সেই যখন তিনি অন্তর্ধান করলেন, তিনি আমাকে বার বার বলতেন, ছ্যাখ্ সুখু—

এমন সময়ে সলিল টিপ করে একটা প্রণাম করলো বাঁড়ুয্যে-মশাইকে। একটু ব্যস্তভাবে বাঁড়ুয্যেমশাই বললেন, জয়স্তু, জয়স্তু, হঠাৎ প্রণাম করলে কেন বাবা?

সলিল জবাবে আবার তাঁর পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়বার চেষ্টা করতেই, তিনি সরে দাঁড়ালেন। বললেন, বাড়াবাড়ি কোরো না সলিল।

তালুকদারের ঠোঁটের কোণে তখন হাসি দেখা দিয়েছে। শীতেশের দিকে ফিরে বললেন, আসুন মিঃ রায়।

বাঁড়ুয্যে এবং সলিল দুজনের দিকেই ফিরে শীতেশ বললো, একটু ঘুরে দেখছি।

সলিল সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকালো অনেকটা স্যাল্যুটের ভঙ্গিতে। বললো, স্যার দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বললেন, পরে কথা হবে মিঃ রায়। খালি একটা কথা বলবো, কারখানা বলে না, যখন যে কোনো প্রয়োজন পড়বে, বাঁড়ুয্যেকে স্মরণ করবেন. আশা করি কাজে লাগবো। আর নেতাজীর কথাটা আপনাকে পরে বলবো। শুধু বলে রাখি, নাইনটিন টুয়েন্টিটুতে জহরলাল নিজে আমাকে একবার লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, শুধু আমার ওপর জহরদার খাঁটি বিশ্বাস ছিল বলে।

তালুকদার এবার শীতেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। বললো, পরে বলবেন বাঁড়ুয্যেমশাই, এই তো সবে জয়েন করেছেন, অঢেল সময় পাবেন। বলে নিচু গলায় শীতেশকে বললো, একটা

ফেরেববাজ, আর গুলবাজ দি গ্রেট।

শীতেশ যে কি বলবে, কিছুই বুঝতে পারছিল না। ও কোনো কথারই সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলো, কাদের কথা বলছেন?

এখনো জিজ্ঞেস করছেন? ওই সলিল মৈত্র আর সুখময় ব্যানার্জি। মশাই, লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে কী গুলবাজী করতে পারে, ধারণা করতে পারবেন না। নেতাজী ওকে সুখু বলে ডাকতেন, জহরলাল লেনিনের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন, আর উনি জহরলালকে জহরদা বলে ডাকতেন—উহ্, শালা পাগল হয়ে যাবার যোগাড়!

শীতেশের সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছিল না। বললো, মানে সবই···

তালুকদার বললো, এর পরেও আপনার সন্দেহ আছে। সেই লোক এখন কী না জুট মিলের ব্যাকিং-এ সিনিয়র সুপারভাইজার। গোঁফ না উঠতে তো চটকলে ঢুকেছে, ও সব ও করলো কবে?

শীতেশের চোখের সামনে বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের মুখটা ভেসে উঠলো। এমন নিরীহ নিষ্পাপ মুখ, নাদুস নুদুস গোলগাল চেহারা, ডাগর ডাগর দুটি চোখ, দেখলে মনে হয়, যেমন শিশু, তেমনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির। মিথ্যা তো দূরের কথা, ঠাট্টা করেও একটা বাজে কথা বলতে পারবেন না। এবার ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সলিল কেন হঠাৎ বাঁড়ুয্যেকে প্রণাম করেছিল। ও এবার আপন মনেই হেসে উঠলো।

তালুকদার জিজ্ঞেস করলো, হাসছেন যে?

সলিল মৈত্রর প্রণামের কথা মনে করে।

উহ্, ও যে কী বদমাইশ, পরে হাড়ে হাড়ে বুঝবেন। এরাই অবিশ্যি বাঁড়ুয্যেকে ভালো চেনে, ওঁকে ওরা 'গুরু' বলে ডাকে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি, এরা কেউ তেমন হার্মফুল লোক না। কিন্তু আজ যা দেখলেন বা শুনলেন, এ প্রায় রোজকার ব্যাপার।

শীতেশের কাছে সেটাও খুব স্বস্তিকর মনে হলো না। একদিকে যেমন হাসি পাচ্ছে, আর একদিকে কেমন যেন ভয়ও লাগছে। ভবিষ্যতে এদের নিয়েই ওকে চলতে হবে। সলিল যদি লুকিয়ে কেবল শরীর ডলাই-মলাই করায়, আর বাঁড়ুয্যেমশাই ওকে দেখলেই ওর কুলশীল এবং ওইসব আত্মকাহিনী বলতে শুরু করেন, তা হলেই মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

তালুকদার ওকে নিয়ে সোজা এলো কাঠের পার্টিশনের মধ্যে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে, নিজে টেবিলের ওপরে বসে, একটি মাত্র চেয়ার দেখিয়ে বললো, বসুন, আগে সিগারেট খাওয়া যাক, তারপরে আবার দেখা যাবে।

শীতেশের মনে হলো, আপাতত এর থেকে ভালো আর কিছু করার নেই।

বেলা এগারোটার ভোঁ বেজে ওঠবার ছু'মিনিট আগেই, তালুকদার শীতেশকে নিয়ে ম্যানেজারের ঘরের দিকে গেল। ভোঁ বেজে যাবার পরে, ম্যানেজারের ঘরের সামনে এলো। বেয়ারা নিজে থেকেই দরজা খুলে ধরলো। চৌধুরি একজন বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাবুটি রোগা সিড়িংগে মতো, ছোট ছোট চোখে চতুর সাবধানী দৃষ্টি যেন সদাই ফাঁদের ভয় পাওয়া পাখির মতো। চৌধুরির সঙ্গে কথা হচ্ছিল খুব নিচু স্বরে। শীতেশকে দেখেই বাবুটি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চৌধুরি ডাকলেন, এসো।

বাবুটির দিকে ফিরে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। ওবেলা ছুটির আগে একবার দেখা করে যেও।

বাবুটি বললো, আচ্ছা স্যার। তারপর শীতেশের দিকে একবার দেখে, বাতাসে মিশিয়ে যাবার মতো, পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেল।

চৌধুরি বললেন, আর বসার দরকার নেই, কোয়ার্টারেই যাওয়া যাক। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। বাইরে এসে বেয়ারাকে বললেন, ঠাণ্ডা মেশিন বন্ধ কর দো। এসো শীতেশ।

শীতেশ চৌধুরির পিছনে পিছনে, মিলের এক প্রান্তে পৌঁছে, ছোট একটি গেট দিয়ে, অন্য জগতে প্রবেশ করলো। বলতে গেলে, নন্দনকানন। সবুজ মাঠ, বাগান, বহু বর্ণাঢ্য ফুলের সমারোহ সেই বাগানে। টেনিস লন, আর একদিকে ব্যাডমিন্টন কোর্ট। দেবদারু আর অর্জুন গাছের ছায়ায় একটা দীর্ঘ অংশ যেন সত্যি হাতছানি দেয়। তারপরেই চোখে পড়ে গঙ্গা নদী। আর এসবের একাধারে রাজকীয় ঝকঝকে প্রাসাদ, ব্লকে ব্লকে ভাগ করা। শীতেশের কেবল চোখ জুড়িয়ে যায় না, মুগ্ধ হয়ে ভাবে, একেবারে নন্দনকানন। এখানে কোয়ার্টার পাওয়া যাবে ভেবে, মনটা যেন এখন থেকেই খুশিতে ভরে উঠেছে। দাদা ঠিকই বলেছিল, এখানকার কোয়ার্টারের মতো ফ্ল্যাট, কলকাতায় হাজার টাকায়ও ভাড়া পাওয়া যায় না।

চৌধুরি একটু ঘুরে গঙ্গার ধারের কাছাকাছি, একটি আলাদা একতলা, অর্ধবৃত্ত প্রাসাদের বারান্দায় উঠলেন। ইতিমধ্যে মালী দারোয়ানদের অনেকগুলো সেলাম তিনি পেয়েছেন। পথে তিনি শীতেশের সঙ্গে একটি কথাও বলেননি, গম্ভীর এবং নীরব। বারান্দা জাল দিয়ে ঘেরা, যাতে মাছি না ঢুকতে পারে। দরজার গায়ে কলিং বেল টিপলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। চাকর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। এ ঘরও এয়ার-কণ্ডিশণ্ড। দুটি কালো কালো ছেলে। দশ বারোর মধ্যে বয়স, সোফায় বসে লুডো খেলছিল। শীতেশের দেখেই মনে হলো, মিঃ চৌধুরির ছেলে।

বিরাট ঘর, রাজকীয় তার সাজসজ্জা। চোখ জুড়ানো পর্দা। সোফা সেট অত্যন্ত দামী। ঘরের দুদিকে দুটো ডিভান, ডানলপিলোর গদী আঁটা। ঘরের আর একদিকে সিঙ্গাপুরী বেতের সোফা সেট। একদিকে প্রকাণ্ড অ্যাকোরিয়াম্, রঙিন মাছের মেলা। টেবিলে ফুলদানীতে ফুল। একপাশে পিয়ানোর ওপরে, গাছের ডালের অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের বিচিত্র নমুনা। মেঝেতে রঙীন ম্যাট পাতা। শীতেশের পা দিতেই সংকোচ হলো। চৌধুরি বললেন, আরাম করে বোসো। তুমি চান করবে তো?

শীতেশ বললো, আজ্ঞে না, আমি ভোরবেলা চান করে বেরিয়েছি।

সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ইচ্ছা করলে আর একবার চান করতে পারো। আর এখন চা-টা কিছু খাও। মাত্র তো এগারোটা বেজেছে।

টা না হোক, চা পানের প্রবল তৃষ্ণা লাগছিল। তবু সংকোচের সঙ্গে বললো শীতেশ, থাক না, এখন আর চায়ের কী দরকার।

কেন, তুমি কি এ সময়ে ভাত খাও?

শীতেশ শশব্যস্ত হয়ে বললো, না না, সে তো বেলা একটা নাগাদ।

চৌধুরি ঘোষণা করলেন, আমিও তা-ই খাই। তুমি বোসো, আমি আসছি। বলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঝণ্টু, রণ্টু, তোমরা কি করছ?

একজন জবাব দিল, লুডো খেলছি বাপী।

চৌধুরি বললেন, খেল, কিন্তু গোলমাল কোরো না।

বলে তিনি অন্য একটি দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হলেন। মুহূর্তে ঝণ্টু আর রণ্টু শীতেশের সামনে এসে দাঁড়ালো। তাদের ঝকঝকে চোখে কৌতূহল থাকলেও, নতুন মানুষের সামনে কিছুমাত্র বিব্রত ভাব নেই। বরং যেন একটু মজা পাওয়া হাসির ছোঁয়া ওদের ঠোঁটে এবং চোখে।

শীতেশ তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা শীতেশের আপাদমস্তক দেখলো। একজন তর্জনী তুলে বললো, সিট ডাউন।

শীতেশ একটু হেসে, একটা নরম গদী সোনালী রঙ সোফায় বসলো। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

আর একজন আঙুলের ইশারায় বললো স্ট্যাণ্ড আপ্।

শীতেশ সোফাটার আশেপাশে তাকিয়ে, অবাক হয়ে বললো, কেন বলো তো?

একজন বললো, এই সোফার গদীর নিচে একটা বিছে ঢুকে রয়েছে।

শীতেশ সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে পড়লো। বিছে-টিছেকে ওর বড়ো

ভয়। জিজ্ঞেস করলো, কী করে ঢুকলো?

আর একজন হাতের চেটোতে আঙুল বুলিয়ে দেখালো, বললো, এই ভাবে।

শীতেশ প্রায় ভয়ে ভয়ে সোফাটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। তৎক্ষণাৎ একজন ওকে ঠেলে সোফার ওপরে বসিয়ে দিলো। এবং দুজনেই হাততালি দিয়ে হাসতে আরম্ভ করলো, সিম্প্‌লি একটা জোক্‌, সিম্প্‌লি একটা জোক্‌।

শীতেশ মনে মনে অবাক ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেও, মনে মনে ভাবলো, যাক্‌, রামগরুড়ের ছানার ছানাগুলো তবু হাসতে জানে। বললো, ও, তোমরা জোক্‌ করছিলে?

হ্যাঁ।

তোমাদের কার কী নাম?

একজন বললো, আমার নাম রন্টু চৌধুরি—ভালো নাম স্বপন। আর একজন বললো, আমার নাম রূপক চৌধুরি, ডাক নাম ঝন্টু। আপনার নাম কী?

শীতেশ তার নাম বললো।

রন্টু বললো, শীতেশ? শীতেশ আবার নাম হয় নাকি?

ঝন্টু বললো, আপনার গায়ে কি শীত আছে?

শীতেশ হেসে বললো, তা বোধহয় আছে।

রন্টু শীতেশের গায়ে হাত দিয়ে বললো, দেখি তো।

ঝন্টু বললো, আমিও দেখি। বলে দুজনেই হাত ঘাড় আর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগলো। শীতেশ অস্বস্তিবোধ করলো। বিশেষ করে, অবিন্যস্ত করে দিচ্ছে বলে।

ঝন্টু বললো, একটু একটু শীত আছে।

রন্টু শীতেশের নাকের ডগা ধরে বললো, আপনার নাকটা বেশ সুন্দর।

ঝন্টু মাথায় হাত দিয়ে বললো, চুলটা এলভিস্‌ প্রিস্‌লির মতো।

শীতেশ মনে মনে বললো, আচ্ছা বিচ্ছু ছেলে তো! মুখে বললো,

তোমরা আর লুডো খেলবে না ?

রন্টু বললো, না, এখন আপনার সঙ্গে কথা বলবো। আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন কেন ?

তোমার বাবা নিয়ে এসেছেন।

ঝন্টু জিজ্ঞেস করলো, অফিসের কাজে ?

শীতেশ একটু ভেবে বললো, বোধহয়।

বন্টু বললো, তাও জানেন না ?

ঝন্টু বললো, আমি বুঝতে পেরেছি।

শীতেশ ঝন্টুর দিকে তাকালো। ঝন্টু মিটমিট করে হেসে বললো, দিদিকে দেখবার জন্য আপনি এসেছেন।

শীতেশ প্রায় চমকে উঠে, অবাক হয়ে বললো, দিদিকে দেখতে ?

ঝন্টু বললো, হ্যাঁ, বিয়ের জন্য দেখতে আসে না ? আপনি সেই-রকম দেখতে এসেছেন না ?

শীতেশ বললো, না তো !

ঝন্টু শীতেশের নাক চিপটে দিয়ে বললো, না তো। আমরা বুঝি জানি না।

এ সময়েই চৌধুরি সাহেবের গলা শোনা গেল, কী হচ্ছে, কী করছ তোমরা ?

ঝটিতি দুজনে ছিটকে সরে গেল অন্য দিকে। এবং একেবারে অন্য দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। চৌধুরির গলা শোনা গেল, এসো তোমরা।

বলতে বলতে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর আগে আগে, ট্রে হাতে বেয়ারা। সামনের টেবিলে ট্রে রাখলো। কাপ ডিস চায়ের সরঞ্জাম ছাড়াও কিছু কেক বিস্কুট চানাচুর এবং সন্দেশ রয়েছে। চৌধুরির পিছনে পিছনে ঢুকলেন একজন মহিলা. তাঁর পিছনে, বলতে হবে দুটি তরুণী। মহিলার রঙ মাজা মাজা, মোটাসোটা। মাথায় একটু ঘোমটাও রেখেছেন। তরুণীর মধ্যে যেটি জ্যেষ্ঠা বলে অনুমতি হয়, সে তার মায়ের মতোই পৃথুলা, কিন্তু রঙটি অবিকল পিতার মতো।

অর্থাৎ চৌধুরি সাহেবের মতো। ঘাড় অবধি চুল ছোট করে ছাঁটা। স্লিভলেস জামা এবং শাড়িটি অতিরিক্ত ঝকমকে। গোলগাল মুখ, ঠোঁটে একটু রঙও ছোঁয়ানো হয়েছে। গাল দুটো এত ফুলো, মনে হয় মুখে কিছু খাবার ঢোকানো আছে। দ্বিতীয়টি পৃথুলা নয়, রঙটিও মাজা মাজা, কিন্তু রক্তহীন ফ্যাকাসে, যেন রুগ্ন। তার সাজগোজও একই রকম, চুলও ঘাড় অবধি।

শীতেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। চৌধুরি এবার ইংরেজিতেই বললেন, এর নাম শীতেশ রায়, আগেই বললাম তোমাদের, ওর দাদাকে আমি খুব ভালোই চিনি। ও আমাদের মিলে ব্যাচিং-এ জয়েন করলো আজ থেকে। আমাদের জুট ডিরেকটর খুব হাইলি প্রেইজ করেছে ওর।

অতঃপর নমস্কার বিনিময়। মিসেস চৌধুরি বললেন, বসুন আপনি।

চৌধুরি বলে উঠলেন, তুমি আর ওকে আপনি করে বলছো কেন? হি ইজ টু-উ ইয়ং, ওনলি টুয়েন্টিসিক্স।

শীতেশ নিজেই বলে উঠলো, নিশ্চয়ই, আপনি আমাকে তুমি বলবেন।

মিসেস চৌধুরি হাসলেন, বললেন, আচ্ছা তা বলা যাবে, তুমি বোসো এখন। বলে তিনি নিজেও বসলেন, মেয়েদের বললেন, তোমরা বোসো। লীনা, তুমি চা তৈরি করে দাও।

পৃথুলা লীনা শীতেশের পাশের সোফায় বসে, হাসি হাসি মুখে চা তৈরি করতে ব্যস্ত হলো এবং একবার মীনার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, মুখ টিপে হাসলো।

চৌধুরি বললেন, আমি ওকে দুপুরে এখানে খেতে বলেছি।

মিসেস চৌধুরি বললেন, বেশ করেছ।

চৌধুরি আবার বললেন, তাহলে তোমরা কথাবার্তা বলো, আমি স্নানটা সেরে নিই। আবার একটু আহ্নিকও আছে। বলে তিনি চলে গেলেন।

মিসেস চৌধুরি শীতেশকে বললেন, তোমার তো দেখছি খুবই অসুবিধা। একটা বাসা-টাসা না হলে রোজ রোজ কলকাতা থেকে আসবে কেমন করে?

শীতেশ ইতিমধ্যেই প্রায় গুটিয়ে যাচ্ছিলো। বললো, হ্যাঁ।

মিসেস চৌধুরী ভ্রূকুটি করে বললেন, কোম্পানির এসব আমি বুঝি না। রেসপনসিব্‌ল্ পোস্টে চাকুরি দেবে, অথচ কোয়ার্টার দিতে পারবে না, এ কেমন কথা।

লীনা বললো, কোম্পানির কোয়ার্টার থাকলে তো দেবে।

মিসেস চৌধুরি বললেন, তা বুঝলাম, কিন্তু শীতেশের অবস্থাটা ভেবে ছাখো।

লীনা ঘাড় বাঁকিয়ে শীতেশের দিকে তাকালো, ফলে তার ঘাড়ের আর গলার মাংসে ভাঁজ পড়লো, যদিও হাসিটি তার যেন সুমধুর লজ্জায় ব্রীড়াময়ী। হাসির তরঙ্গে, ফোলা গালে ঢেউ লাগলো। শীতেশ তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারলো না, দৃষ্টি নত হয়ে গেল। বুকের মধ্যে কেমন যেন টিপটিপ করছে।

লীনা গলার স্বরে মধু ঢালবার চেষ্টা করে বললো, কোম্পানি নিশ্চয়ই বরাবর আপনাকে এ অবস্থায় রাখবে না?

শীতেশ প্রায় চমকে উঠে বললো, অ্যাঁ! মানে, না। বলেছে এক বছরের মধ্যে কোয়ার্টার দিতে পারবে না।

শীতেশের চমকানি দেখে, সকলে কী ভাবলো, বোঝা গেল না। মা ও কন্যাযুগল নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে মুখ টিপে হাসলো।

মীনা বললো, এখানকার এনভার্ণমেন্ট যে বিচ্ছিরি। তা না হলে শীতেশবাবুকে তো আমাদের কোয়ার্টারেই রাখা যেত।

শীতেশের চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ঝণ্টু আর রণ্টুর মুখ দুটি জেগে উঠলো, আর শিরদাঁড়ার কাছে কেঁপে কেঁপে উঠলো। এখনও অবিশ্যি বাকীদের বুঝে ওঠা যায়নি। কিন্তু রামগরুড়ের ছানা চৌধুরি সাহেবের মুখটিও মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে। জন্ম জন্ম কোয়ার্টার না পেলেও যেন, এখানে থাকতে না হয়।

মিসেস চৌধুরি হুস করে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা হলে তো কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু চটকল কোয়ার্টার, যা জায়গা, কান পাতা যাবে না।

লীনা গাল আর ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, সত্যি। কিন্তু আমরা যদি তাদের কথায় কান না দিই, তা হলে?

মিসেস চৌধুরি বললেন, তা আমরা না দিতে পারি, তবু কান পাতা যাবে না।

মীনা বললো, কিন্তু ধরো, শীতেশবাবু যদি আমাদের আত্মীয় হতেন, তা হলে?

মিসেস চৌধুরি খুশির হাসি হেসে বললেন, তা হলে তো কথাই ছিল না।

মীনা আবার বললো, হয়ে যেতেও তো পারেন। কী বলেন শীতেশবাবু?

শীতেশ সঠিক বুঝতে পারছিল না, কথা কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছে, অথচ ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি আর আতঙ্কবোধ ওকে প্রায় মুহ্যমান করে তুলছিল। ও সুপ্তোত্থিতের মতো বললো, অ্যাঁ, আত্মীয়? হ্যাঁ, তা তো…।

মীনা লীনার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, রক্তহীন চোখের তারা ঘুরিয়ে যেন একটা ইশারাও করলো। শীতেশ তা দেখতে পেলো এবং সেই মুহূর্তেই লীনা তার হাসি বিস্ফারিত লজ্জা বেগুনি রঙ মুখখানি শীতেশের দিকে ফেরালো।

শীতেশ হাসা উচিত কী না বুঝতে পারলো না, কিন্তু মনে মনে বললো, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

লীনা খাবারের প্লেট শীতেশের দিকে বাড়িয়ে, ওর দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে বললো, নিন খাবার নিন।

শীতেশ বললো, এখন আর খাবারের দরকার ছিলো না, একটু চা হলেই—।

মিসেস চৌধুরি বলে উঠলেন, তা বললে কি হয়? কলকাতা

থেকে সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছ। অন্তত: একটা কেক আর দুটো সন্দেশ খাও।

লীনা বললো, তা-ই বা বলছ কেন মা, এ সব খাবারগুলোই উনি খাবেন।

বৌদি নেই, শীতেশ কাকে বলবে, মুটকিটা কী সর্বনাশী, বলে কী না, এতগুলো খাবার গিলতে হবে। ও নিজে খেলেই তো পারে। ও করুণভাবে বললো, বিশ্বাস করুন, আমি এখন এত খেতে পারবো না। আমি একটা সন্দেশ খাচ্ছি। লীনা আবদারের সুরে বললো, না তা হবে না, একটার বেশি খেতে হবে। নিন। বলে আরো ঝুঁকে এলো, আর রঙচঙে শাড়ির আঁচল প্রায় শীতেশের পায়ের কাছেই খসে পড়লো। যদিও লীনা সেই মুহূর্তেই তা তুলে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো না। কালো কষ্টিপাথর-সদৃশ, সংক্ষিপ্ত কাচুলি-বেষ্টিত বিপুল বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র, শীতেশের প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। প্রায় খাবলা দিয়ে দুটো সন্দেশ তুলে নিয়ে, মুখ নামিয়ে খেতে আরম্ভ করলো। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। তারপরে জল, তারপরে লীনার হাত থেকেই চায়ের কাপ নিতে হলো।

ইতিমধ্যে লীনার অন্যমনস্কতা কেটেছে, আঁচলটা বুকে তুলেছে। লীনা জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি চা খাবে?

মিসেস চৌধুরি বললেন, না বাবা, আমি আর এখন চা খাবো না। তোরা বোস, শীতেশের সঙ্গে গল্প কর, আমি একটু কিচেনে গিয়ে দেখি, রান্নার কী ব্যবস্থা হচ্ছে। বলে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, শীতেশ আমি একটু যাচ্ছি। তুমি কোনোরকম লজ্জা কোরো না, নিজের বাড়ির মতো মনে করবে, কেমন?

শীতেশ হাসবার চেষ্টা করে বললো, তা তো নিশ্চয়ই।

মিসেস চৌধুরি আবার বললেন, আর মীনু, তুই শীতেশকে বাবু বলিস না। বড্ড কানে লাগে। বরং দাদা বলিস। সেই ভালো, না শীতেশ?

শীতেশ চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি ঠোঁট তুলে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, সেই তো ভালো।

মীনা ফ্যাকাশে মুখে হাসি বিস্তৃত করে বললো, সেই ভালো, আমি শীতেশদা বলবো। মিসেস চৌধুরি চলে গেলে লীনা জিজ্ঞেস করলো, আর আমি কী বলে ডাকবো?

মীনা বললো, তুমি? বলে শীতেশের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বললো, তুমি সেটা শীতেশদার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নিও। সেটাই ভালো, না শীতেশদা?

শীতেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

শীতেশের চা খাওয়া হয়ে যেতেই, লীনা বলে উঠলো, আপনি কোট আর টাইটা খুলুন তো। ফ্যাক্টরির কাজের সময়, কেউই এসব পোশাক পরে না।

শীতেশ আজ সেটা লক্ষ্য করেছে। কাজের অসুবিধাও অনেক। ও কোট খোলবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই, লীনাও উঠে দাঁড়ালো এবং নিজেই শীতেশের কাঁধের কাছ থেকে কোট সরিয়ে, হাতা ধরে টেনে খুলে নিল। শীতেশ ব্যস্ত হয়ে কিছু বলবার অবকাশ পাবার আগেই, লীনার হাত উঠেছে শীতেশের টাই-এর নটে। তার বিপুল অঙ্গ শীতেশকে প্রায় স্পর্শ করছে। শীতেশ বলে উঠলো, থাক থাক, আমিই খুলছি।

লীনা ততক্ষণে, টাই-এর ফাঁস আল্‌গা করে খুলতে আরম্ভ করেছে, বললো, আমি টাই খুলতে এবং বাঁধতে ভালোই জানি।

সে তো শীতেশ দেখতেই পাচ্ছে। কিন্তু এই সেবা যত্নের হাত থেকে কখন নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? এর থেকে যে রামগরুড়ের ছানার নিঃশব্দ গাম্ভীর্য অনেক ভালো। লীনা একটা সোফার গায়ে কোট আর টাই রেখে দিলো। শীতেশের যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেল, বললো, আমি একটু সিগারেট খেতে পারি?

মীনা বলে উঠলো, অবকোর্স। আপনি বুঝি খুব ম্যানার্স মেনে চলেন?

শীতেশ বললো, না, তা না, তবে তা হলেও—। বলতে বলতে সোফার কাছে গিয়ে, কোটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে, সিগারেট ধরালো।

মীনা বলে উঠলো, আমাদের অফার করলেন না ?

শীতেশ চমকে উঠে বললো, আপনারা—মানে—।

লীনা মীনা দুজনেই হেসে উঠলো। লীনার গলার স্বর আর মীনার মোটা গলার হাসি এক বিচিত্র হারমোনি।

লীনা বললো, ওর কথা শুনছেন কেন। ও ভারি ফাজিল।

মীনা চোখ ঘুরিয়ে বললো, কিন্তু শীতেশদা, আপনি আমাদের আপনি করে বললেন যে ? শীগগির তুমি করে বলুন।

শীতেশ অসহায়ভাবে বললো, পরে বলবো।

না, এখুনি বলতে হবে। বলুন, বলুন।

শীতেশ আরো অসহায়ভাবে বললো, মানে—এখুনি ঠিক আসছে না। পরে ঠিক বলবো, দেখবেন—

না আমি দেখতে-টেখতে চাই না, এখুনি শুনতে চাই। বলুন বলছি।

মীনার ফ্যাকাশে চোখ রীতিমত পাকিয়ে উঠলো। শীতেশ দেখলো, লীনা মোটা মোটা ঠোঁট ছুঁচলো করে হাসছে। শীতেশের মনে হলো, এটাও ওর একটা চাকরিরই অঙ্গ। ওর চোখের সামনে কেবল বৌদির মুখটা ভাসতে লাগলো। থাকতো বৌদি, তা হলে এই মুটকি আর শুটকিকে টিট করে ছেড়ে দিত। ও ক্ষীণ গলায় উচ্চারণ করলো, তুমি।

মীনা বলল, বাহ্, শুধু তুমি মানে কী ? আমাকে কিছু বলুন।

কী বলবো ?

তা আমি কী জানি। একটা কিছু বলুন।

শীতেশ ঢোক গিলতে গিলতে বললো, মীনা তুমি খুব ভালো।

ভেরি গুড ! মীনা ফ্যাক ফ্যাক করে হাসলো। আবার বললো, আপনার বাসা হয়ে গেলে, আমরা রোজ সেখানে যাবো। দিদি গিয়ে

আপনার দেখাশুনা করবে।

দেখাশোনা! কী ভয়ংকর! শীতেশের মনে হলো, এ চাকরি করাটা বোধহয় ওর কপালে সইবে না। তা না হলে এ কথা আসছে কেমন করে, লীনা ওকে দেখাশোনা করতে যাবে! ও খুব অমায়িকভাবে হেসে বললো, না না, তার কি দরকার, আমার কাজকর্মের জন্যে তো লোক থাকবে।

মীনা বললো, বা রে, দিদি কি আপনার কাজকর্ম করতে যাবে নাকি? দিদি যাবে আপনার ঘর সংসার দেখতে, সব ঠিকঠাক চলছে কী না। আপনি কি চান না, দিদি আপনার বাসায় যায়?

শীতেশ বলে উঠলো, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মীনা বললো, আমি যাবো, মা যাবে, দিদি যাবে, আমরা সবাই যাবো।

শীতেশ করুণ হেসে বললো, সে তো খুব ভালো কথা।

মীনা বললো, বাবা তো আপনাকে এর মধ্যেই খুব ভালোবেসে ফেলেছে।

যদিও শীতেশ তা বুঝতে পারেনি এবং সেই সুযোগই বা কোথায় পাওয়া গেল, বুঝতে পারলো না!

এবার লীনা বললো, য়ু আর রিয়েলি লাকি।

মীনা বললো, বাবা তো বলছিলেন, আমরা ছাড়া আপনার এখানে কেউ নেই। আমাদেরই আপনাকে দেখাশোনা করতে হবে।

স্বয়ং ম্যানেজার এবং লেবার অ্যাডভাইসারের ইচ্ছে। এর ওপরে কথাই চলে না। কিন্তু এত সব কথা হলো কখন? টেলিফোনে? নিশ্চয় তা-ই-ই। অফিস থেকে চৌধুরি টেলিফোনেই সব কথা বলেছেন।

মীনা হঠাৎ উঠলো, বললো, আমি স্নানটা সেরে নিই গে, দিদি তুমি শীতেশদার সঙ্গে কথা বলো।

মীনা চলে গেল। শীতেশের মনে হলো, ও যেন অগাধ জলে পড়লো। এখন মনে হচ্ছে, মীনা থাকলে ভালো হতো। কেননা,

লীনা কিছুই বলছে না, কেবল সলজ্জভাবে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। যেন কি এক রহস্য করছে। এ সব ভাব ভঙ্গির মানে কী? কিছু বলতে চায় নাকি? শীতেশ আবার সিগারেট ধরালো।

লীনা হঠাৎ বললো, চুপ করে আছেন কেন, কিছু বলুন।

শীতেশ ব্যস্তভাবে বললো, হ্যাঁ, এই মানে ইয়ে, কী বলছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার একটু গঙ্গার ধারে যেতে ইচ্ছা করছে।

লীনা অবাক হয়ে বললো, গঙ্গার ধারে? বাইরে তো ভীষণ রোদ।

শীতেশ নিভে গিয়ে বললো, ওহ্, তাও তো বটে।

লীনা বললো, এই ঠাণ্ডা ঘরই তো ভালো। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে।

ওহ্! এই শব্দ করা ছাড়া শীতেশ আর কিছু ভেবে পেলো না।

লীনা আবার বললো, জানেন, আমার আজ ঘুম ভেঙেই মনে হচ্ছিল, নতুন কারো সঙ্গে আজ আমার দেখা হবে, যাকে দেখলে মনটা আনন্দে ভরে উঠবে।

শীতেশ অবাক স্বরে বললো, তাই নাকি?

লীনা বললো, হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

কেন? কেন কেন কেন? ঈশ্বর, শীতেশের মুখে একটা জবাব যুগিয়ে দাও। ও আমতা আমতা করে বললো, মানে আপনার মনটা—আপনার মনটা তো খুব ইয়ে, সেই জন্যই।

লীনা বললো, আর দেখুন, আজ ঠিক আপনি এসে পড়লেন। একেই বোধহয় টেলিপ্যাথি বলে, তা-ই না?

শীতেশ কী বলবে ভেবে উঠতে উঠতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। লীনা ঘরের একপাশে টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে ইংরেজিতে বললো, ইয়া, হু স্পিকিং? নীতিশ রয়? ফ্রম ক্যালকাটা?……

শীতেশ যেন অকূলে কূল পেল। লাফ দিয়ে উঠে বললো, দাদা! আমার দাদা!

লীনা তখনো বলে চলেছে, য়ু ওয়ান্ট টু টক উইথ মিঃ চৌধুরি?

ও. কে. প্লিজ হোল্ড অন্।

শীতেশ ততক্ষণে টেলিফোনের কাছে ছুটে গিয়েছে। বললো, নীতিশ রায় বলছেন? উনি আমার দাদা, দিন আমি একটু কথা বলি, আপনি ততক্ষণ মিঃ চৌধুরিকে ডেকে দিন। বলে শীতেশ রিসিভারটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বললো, হ্যালো!

ওপার থেকে নীতিশের গলা ভেসে এলো, গুড মর্ণিং মিঃ চৌধুরি, আমি নীতিশ রায় বলছি।

শীতেশ বলে উঠলো, দাদা আমি, আমি, আমি কথা বলছি।

ওপার থেকে ব্যগ্র প্রশ্ন এলো, কে ফোঁচা?

হ্যাঁ দাদা।

নীতিশের গলায় উদ্বেগ, কিন্তু তোর গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে না কি?

শীতেশ চকিতে একবার দেখে নিলো, লীনা আছে কী না? নেই, বললো, সে তোমায় বাড়ি গিয়ে বলবো।

ওপার থেকে নীতিশ ছাড়লো না, জিজ্ঞেস করলো, তবু বল না, কী হয়েছে? চাকরির ব্যাপারে কোনো গোলমাল নাকি?

শীতেশ বললো, না না, সে সব ঠিক আছে। ব্যাপার অন্যখানে, মানে মানে—।

ওপার থেকে আবার প্রশ্ন এলো, তুই মিঃ চৌধুরির কোয়ার্টারে গেছিস কেন?

উনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, দুপুরে এখানে খাবার জন্য।

নীতিশের উল্লসিত গলা শোনা গেল, বাহ্ ফাইন, এ তো দারুণ ব্যাপার রে।

শীতেশ বললো, মারাত্মক!

এই মুহূর্তেই চৌধুরি এসে পড়লেন, জিজ্ঞেস করলেন, কে, তোমার দাদা?

শীতেশ মুহূর্তের মধ্যে বিনীত ভঙ্গি ফুটিয়ে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।... দাদা উনি এসেছেন, কথা বলো। বলে রিসিভার চৌধুরির হাতে তুলে

দিলো। চৌধুরি গম্ভীর স্বরে বললেন, হ্যাঁ, হ্যালো·· হ্যাঁ বুঝেছি, তোমাকে আর এত করে নিজের পরিচয় দিতে হবে না। আমি অবিশ্যি এক্সপেক্ট করছিলাম, তুমি আমাকে টেলিফোন করতে পারো।···হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তার আগেই তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি· ·আরে, তোমাকে আর এত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে না। আমার স্ত্রী বলছিলেন, যে ক'দিন ওর নিজের একটা বাসা আর চাকর না জুটছে, সেই ক'দিন দুপুরে আমাদের এখানেই খাবে...

শীতেশের বুকটা কাঁপতে লাগলো। সেই ক'দিন এ বাড়িতে খেতে আসতে হবে? আর দাদা নিশ্চয় শুনে আনন্দে আটখানা হচ্ছে। ওহ্, তার চেয়ে স্টেশনের কাছে উড়িয়া হোটেলের খাদ্য অমৃত বলে মনে করা যেত। দাদা কেন একটা যুক্তি দেখিয়ে ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিচ্ছে না? পরমুহূর্তেই শীতেশের মনে হলো, আগামীকাল থেকে তো আমার পেটের অসুখ করতে পারে। দই চিঁড়ে ছাড়া আমার কিছুই খাওয়া চলবে না। আহ্ মনে করতেও কী আরাম আর স্বস্তি বোধ হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তই স্থির, আগামীকাল থেকে পেটের অসুখ।

চৌধুরি তখনো কথা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি আর কী বলবো, জুট ডিরেক্টর তো··দেখেছ? যাক্, তোমার খবর সব ভালো? · তোমরা তো এই দু'ভাই-ই, হুম্! বোন-টোন আছে নাকি?···বিয়ে হয়ে গেছে, বাহ্, বেশ ভালো। তোমার বাবা মা দুজনেই জীবিত?— খুব ভালো খুব ভালো। আচ্ছা এখন ছাড়লাম, তুমি কিছু ভেবো না।

চৌধুরি রিসিভার রেখে এগিয়ে এলেন। একটা ধুতি দোভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরা। হাতাওয়ালা গেঞ্জি। গলায় পৈতা দেখা যাচ্ছে। এসে সোফায় বসে বললেন, নীতিশ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, এখন বোধহয় একটু আশ্বস্ত হয়েছে। তোমার দাদা ছেলেটিও বেশ ভালো। একটা কোনো ছুটির দিনে ওকে আসতে বললাম! দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।

শীতেশ বসতে না বসতেই খাবার ডাক পড়লো। চৌধুরি বললেন, চলো।

বাড়িটার ভিতরেও যথেষ্ট সাজানো গোজানো, সবই রাজকীয়। তবে আর কোনো ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত না। মনে হয় আট দশটা ঘর আছে। ডাইনিং রুম বিরাট, টেবিলও বিরাট। ইতিমধ্যেই তাতে খাবার সাজানো হয়েছে। বেয়ারা পরিচালকরাই সব করছে, মিসেস চৌধুরি পরিচালনা করছেন। প্রথমে চৌধুরি বসলেন, তারপরে শীতেশকে বসতে বলা হলো। শীতেশের পরে লীনা মীনা এবং মিসেসও বসলেন। দেখা পাওয়া গেল না কেবল সেই বিচ্ছু ডুটোর। সে ডুটোকে বোধ হয় আগেই খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। খাবার আয়োজন প্রচুর। মাছ মাংস নিরামিষ তরকারি, মিষ্টি, দৈ। বোঝা যাচ্ছে, সবই সকালবেলা অফিস থেকে টেলিফোনে ব্যবস্থা হয়েছে। মিসেস চৌধুরি যাকে বলে একেবারে জামাই আদরে শীতেশকে খাওয়াতে লাগলেন। আর শীতেশ মনে মনে বললো, সত্যি সত্যি আমার পেটের অসুখ করবে। কিন্তু মুটকিটা সে-রকম খেতে পারছে না। কিংবা হয়তো লজ্জা পাচ্ছে, শুটকিটা খাচ্ছে মন্দ না।

খাবার শেষে আবার সেই বাইরের ঘর। শীতেশ ভগবানকে জপছে, কেউ যেন না আসে। চৌধুরি অবিশ্যি বলে দিয়েছেন, শীতেশ যেন এখন একটু বিশ্রাম করে। ডুটোর সময় আবার মিলে যেতে হবে। কিন্তু তাঁর কথা কি থাকবে? হয়তো দেখা যাবে—না ভাববার অবকাশ আর পাওয়া গেল না। মীনা এসে পড়লো। তার হাতে কতকগুলো ইংরেজি ফ্যাশান আর ফিল্ম জার্নাল। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে বললো, ইচ্ছে হলে এগুলো দেখবেন। মিলে যাবার আগে কি চা খাবেন?

শীতেশ বলে উঠলো, অসম্ভব!

মীনা চোখ টেরিয়ে বললো, ভয় পেয়ে গেলেন মনে হচ্ছে?

শীতেশ বললো, ভয় পাচ্ছি। এত খাবার পরে কেউ চা খেতে পারে?

তা হলে বিকেলে কলকাতা যাবার আগে চা খেয়ে যাবেন।

এখন বিশ্রাম করুন। বলে মীনা চলে গেল।

শীতেশ সিগারেট ধরিয়ে ভাবলো, এর পরে আবার লীনা আসবে কী না। ভাবতে ভাবতেই লীনা এলো, দূরের দরজা থেকে বললো, বিশ্রাম করুন।

শীতেশ বললো, আচ্ছা।

কিন্তু লীনা চলে গেল না, বললো, 'আর যদি বলেন, আমি বসতে পারি।

শীতেশ তাড়াতাড়ি বললো, না না না, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি ঠিক আছি।

লীনা তবু একটু দাঁড়িয়ে থেকে, যেন অনিচ্ছায় চলে গেল। শীতেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এতক্ষণে একটু আরাম বোধ করছে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে সিগারেট পান শেষ করে, ও লম্বা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে রইলো। ভাবতে চেষ্টা করলো, সকাল থেকে কী কী ঘটেছে, কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এর মধ্যেই ওর একটু তন্দ্রা মতো এসে পড়েছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙলো, রেকর্ডের মিউজিকের শব্দে। ও চমকে উঠে বসলো। দেখলো, বিদেশী মিউজিকের সঙ্গে, ঝণ্টু আর রণ্টু ঘরের এক পাশে ট্যুইস্ট নাচছে। ঝণ্টুর গায়ে শীতেশের কোটটা ওর হাঁটুর কাছে ঝুলছে। আর টাইটা রণ্টুর গলায় জড়ানো। বোঝা যাচ্ছে, এ শব্দ, চারদিক বন্ধ এঘরের বাইরে বিশেষ যাচ্ছে না। শীতেশের মনে প্রথমেই যে কথাটা এলো, তা হলো—শালা! তারপরে—এরা বিচ্ছু না খচ্চর?

কিন্তু উপায় নেই। ও আবার আগের মতোই এলিয়ে পড়ে রইলো। কিছু বলতে গেলে হয়তো পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলার মতো হবে। ঝণ্টু ডাকলো, শীতেশদা, নাচবেন?

শীতেশ দাঁতে দাঁত টিপে মনে মনে বললো, তোদের বাবাকেলে শীতেশদা।...

পাঁচটার ছুটির পরে চৌধুরির কোয়ার্টারে আর যেতে হলো না।

কারণ টাইম টেবিলে দেখা গেল, চা খেতে গেলে, পরবর্তী ট্রেনের অনেক দেরি হয়ে যাবে। চৌধুরি নিজেই সদয় হয়ে শীতেশকে ছেড়ে দিলেন।

কলকাতায় যখন শীতেশ ফিরলো তখন সত্যি ওর চেহারা বদলে গিয়েছে। নীতিশও ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরেছে। শীতেশের মুখ থেকে সব শুনে, তার মুখও কালো হয়ে গেল। তবে শেষ পর্যন্ত নীতিশের মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। ও বললো, চৌধুরি যদি তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা হলে তখন বলতে হবে, জলপাইগুড়িতে বাবা মা বহুকাল আগেই মেয়ে দেখে রেখেছেন এবং কথাও দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

সরস্বতী ফোঁস করে উঠলো, এত মিথ্যেরই বা কী দরকার! এটা জ্যৈষ্ঠ মাস যাচ্ছে। আসছে আষাঢ় মাসেই আমার পিশতুতো বোনের সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দাও না! তা হলে কোনো কথাই ওঠে না।

নীতিশ বলে উঠলো, নাও, টকের জ্বালায় পালিয়ে এলুম, তেঁতুলতলায় বাস।

সরস্বতী ক্ষেপে বললো, ওহ্ আমার বোন এতই ফ্যালনা? তবে যাও, ম্যানেজারের ওই মুটকি মেয়ের সঙ্গেই ভাইয়ের বিয়ে দাও গে। বলে সে ঝটিতি সরে গেল।

নীতিশ হতাশভাবে বললো, এসব কী হচ্ছে, আমি তো কিছুই বুঝছি না।

শীতেশ অসহায় ভাবে বললো, আমিও না। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই চাকরিটাই গোলমেলে।

নীতিশ রেগে উঠে বললো, বাজে কথা বললে মারবো এক থাপ্পড়। চাকরির বিষয়ে তুই আর একটা কথাও বলবি না।

শীতেশ বললো, বেশ বলবো না। বলে ওর নিজের ঘরে চলে গেল। গিয়ে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো।

পরের দিন অন্ধকার থাকতেই ওকে বেরোতে হলো। কারণ আজ ভোর ছ'টায় ওকে হাজিরা দিতে হবে। যদিও চৌধুরি বলে দিয়েছেন পনের মিনিট আধঘন্টা দেরি হলে ক্ষতি নেই। সেটা উনি দেখবেন। তথাপি ও প্রায় ঠিক সময়েই মিলে এলো। আজ দারোয়ান কিছু জিজ্ঞেস তো করলোই না, বরং সেলাম ঠুকলো। তার মানে শীতেশকে চিনে গিয়েছে। ও ডিপার্টমেন্টে ঢুকতেই, তালুকদার জানালো, চৌধুরি সাহেব দেখা করতে বলেছেন। শীতেশ গিয়ে দেখা করলো। চৌধুরি বললেন, বোসো। তোমার বাসার ব্যবস্থা দু-একদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। বড়বাবু লোকটি খুব কাজের, এ শহরের খুব পুরনো লোক। হয়তো আজই একটা বাড়ির খোঁজ দিতে পারেন। আর কাজের লোকও একটি পাওয়া গেছে, এ সারভেন্ট-কাম-কুক। বাঙালী ছেলে। শীতেশ মনে মনে স্বস্তি পেল, খুশি গলায় বললো, খুবই ভালো হবে।

চৌধুরি বললেন, এ খবরটা দেবার জন্যই তোমায় ডেকেছিলাম। এগারোটার সময় চলে এসো তা হলে।

সঙ্গে সঙ্গে শীতেশের মুখ শুকিয়ে গেল। ক্ষীণ স্বরে বললো, আমার আবার আজকে পেটটা খারাপ হয়েছে।

চৌধুরি ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আমাশা না ডাইরিয়া?

শীতেশ কিছু না ভেবেই বলে ফেললো, বোধহয় দুটোই।

দুটোই? এভাবে কাজ করবে কী করে? যাই হোক, কিন্তু কিছু খেতে হবে তো?

খাওয়াটা উচিত হবে না বোধহয়।

তা হয় না। যাই হোক, তুমি আগে একবার আমাদের ডাক্তারের কাছে যাও। গুপ্ত দেখে শুনে কোনো ওষুধ দিক। বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে বললেন, আমার কোয়ার্টারে দাও।...কয়েক সেকেণ্ড পরে বললেন, কে? লাহু? তোর মাকে ডেকে দে...ও, তুমি কাছেই আছ? শোন, শীতেশের পেটটা গোলমাল করেছে...মনে

হয় ইনডাইজেশন থেকে কিছু হয়েছে ।...কী বললে ? স্টু করবে ? তা হলে তা-ই করো। এখন ওকে আমি ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্ছি।

বলে রিসিভারটা নামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চেপে, আবার তুলে বললেন, ডঃ গুপ্তকে দাও।...হ্যালো, গুপ্ত, আমি চৌধুরি বলছি। শোনো, আমাদের ব্যাচিং-এর নতুন ওভারসিয়ার মিঃ রায় যাচ্ছেন তোমার কাছে। ওর পেটটা খারাপ হয়েছে। দেখে একটু ওষুধ দাও তো। হ্যাঁ, এখুনি যাচ্ছে।...

রিসিভার নামিয়ে বেল পুশ করলেন। বেয়ারা ঢুকলো। চৌধুরি বললেন, সাবকো লেকে ডাক্তার সাবকো পাশ যাও।

শীতেশের দিকে ফিরে বললেন, ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে বেশি ঘোরাঘুরি কোরো না। এগারোটার সময় চলে এসো।

শীতেশের মনে হচ্ছিল, ওর ভিতরে তখন কান্না জমে উঠেছে। পেটের অসুখের কথা বলতে গিয়ে যে এমন হিতে বিপরীত হবে, কে ভেবেছিল ? এখন ও অসুস্থের মতোই উঠলো এবং বেয়ারাকে অনুসরণ করলো। ডাক্তারখানায়, আউটডোরে শ্রমিকদের বেশ ভিড়। শীতেশ ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলো। ইতিপূর্বেই এই ব্যাচেলর ডাক্তার সম্পর্কে কিছু কথা শোনা ছিল। কিন্তু ব্যাচেলরটির তুম্বো মুখ এবং কাঁচা পাকা চুল দেখে, অবাক হতে হয়। এখনো কেন ইনি ব্যাচেলর কে জানে। ডেকে বললো, আসুন আসুন। আপনার কথা গতকালই শুনেছি। কী হয়েছে ?

শীতেশ বললো, এমন কিছুই না। চৌধুরি সাহেব একটু বেশি চিন্তা করেন।

ডাক্তার হেসে বললো, মানে খুবই স্নেহ করেন। পেটে ব্যথা আছে নাকি ? কিম্বা গড়গড় করা ?

না।

কতবার পায়খানা গেছেন ?

বারছয়েক।

তবে তো কিছুই হয়নি বলতে হবে। খুব পাতলা বা আম

বেরিয়েছে ?

সে-রকম তো মনে হয়নি।

ডাক্তার হেসে ফেললো। বললো, তা হলে কী চিকিৎসা করবো বলুন তো ? ছুটি চান নাকি ? ডাক্তারের তুম্বো মুখে হাসি।

শীতেশ বললো, না না, ছুটি চাই না। আসলে কী হয়েছে জানেন, চৌধুরি সাহেবকে যেই বলেছি, পেটটা একটু খারাপ, অমনি উনি—।

ডাক্তার বললো, বুঝেছি বুঝেছি, স্নেহের দৌরাত্ম্য হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওষুধ-বিষুধ কিছু খাবেন ?

দরকার নেই। তবে দেখবেন, আপনি আবার কিছু—।

কিছু বলবো না, নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন, বলে দেবো, ওষুধ দিয়ে দিয়েছি, আপনি মোটামুটি ভালোই আছেন।

শীতেশ সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করলো। লোকটি দেখতে যা-ই হোক, মানুষটি ভালো। অন্তত লোকের মন বুঝতে পারে। ও বললো, চলি তা হলে।

ডাক্তার বললো, আসুন। পরে আবার কথা হবে।

শীতেশ বেরিয়ে এসে দেখলো, চৌধুরির বেয়ারা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চলে যেতে বললো। ডিপার্টমেণ্টের দিকে খানিকটা যেতেই লেবার অফিসার চিত্তবাবু ছুটে এলো, গুডমর্ণিং স্যার। ডাক্তারখানায় গেছিলেন কেন ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

শীতেশ বললো, না না, সে-রকম কিছু না।

চিত্তবাবু বললো, আমি স্যার আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

কী ব্যাপার বলুন তো ?

চিত্তবাবু বললো, আমি স্যার আপনার জন্য একটা ভালো বাড়ি দেখেছি।

শীতেশ অবাক হয়ে বললো, এর মধ্যেই দেখে ফেলেছেন ?

নিশ্চয়ই। কাল মিল থেকে বেরিয়ে শুধু এ কাজটাই করেছি। দারুণ বাড়ি স্যার, মাত্র একশো টাকা ভাড়া, দোতলায় দুটো ঘর, অল্প

সেপারেট, ভদ্রপল্লী। বামুন কায়েত ছাড়া পাবেন না।

শীতেশ বললো, কিন্তু দেখুন, মিঃ চৌধুরি আবার বড়বাবুকে দিয়ে বাড়ির খোঁজ করছেন।

বড়বাবু? মানে ওই লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী?

নামটা তো জানি না।

বুঝেছি বুঝেছি। আরে ও তো থাকে ব্যাওরাপাড়ায়, শুয়ারে ভর্তি পাড়া। ও আবার ভালো বাড়ি দেখবে কোথায়? আপনি ম্যানেজার সাহেবকে বলে দেবেন, আপনি পছন্দমতো বাড়ি পেয়ে গেছেন, তা হলেই হবে।

শীতেশ বললো, আচ্ছা, দেখি কী হয়।

চিত্তবাবু বললো, দেখি-টেখি না। আমার আবার স্যার মনটা অন্যরকম, কারোর উপকার করতে না পারলে—মানে কাল তো প্রায় ঘুমোতেই পারিনি। আমার মেয়ে বৌ পর্যন্ত অবাক।

শীতেশের শিরদাঁড়াটা যেন আবার কেঁপে উঠলো, কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। হঠাৎ চিত্তবাবু এমন উপকার করতে চাইছেন কেন।

চিত্তবাবু বললো, যে বাড়িটা দেখেছি, সেটা আমাদের বাড়ির পাশেই। আমরা কাছে থাকলে আপনার একটু দেখাশোনাও করতে পারবো, বুঝলেন না?

আবার সেই দেখাশোনা! শীতেশ বললো, আচ্ছা, দেখুন তা হলে।

কিন্তু কথাটা এখন পাঁচ কান করবেন না। সবাই তো লোক ঠিক না।

শীতেশ ঘাড় নাড়তে নাড়তে ডিপার্টমেন্টে এসে ঢুকলো। তালুকদার বিভাগীয় বাবু অমলকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলছিলো, সামনে দুজন শ্রমিকও দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীতেশকে দেখে বললো, আপনি নর্থ মেশিনের দিকে যান, একটু দেখুন।

শীতেশ সেদিকেই গেল। তাকে দেখে শ্রমিকরা সকলেই একটু ত্রস্ত ব্যস্ত হলো। কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানালো। ও মেশিনের কাছে গিয়ে প্রত্যেকের কাজ দেখতে লাগলো। এ সময়েই শুনতে

পেলো—গুডমর্ণিং স্যার।

তাকিয়ে দেখলো, সলিল মৈত্র। প্রায় মিলিটারি ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকালো। শীতেশ বললো, মর্ণিং।

এই যে মিঃ রায়, গুডমর্ণিং, ভালো আছেন তো? বাঁড়ুয্যেমশাই ঢলঢল করতে করতে এগিয়ে এলেন।

শীতেশ বললো, ভালো।

বাঁড়ুয্যের দৃষ্টি তেমনি মুগ্ধ। মুগ্ধ চোখে শীতেশের দিকে তাকিয়ে একেবারে সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, আমি তো বলেছি, এ কপালের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সৌভাগ্যের সব চিহ্ন বর্তমান। তা না হলে কাল রাত্রেই অমন সুন্দর একটা বাড়ির খোঁজ মিলবে কেন?

সলিল জিজ্ঞেস করলো, কার জন্য বাঁড়ুয্যেদা?

মিঃ রায়ের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, এমনিতে আমার কিছু মনে ছিলো না, কিন্তু সাবকন্‌সাস্ মাইণ্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিলো, মিঃ রায়ের জন্য একটা বাড়ি চাই। আসলে উনি আমার ওভারসিয়ার হলে কী হবে, বয়সটা দেখতে হবে তো। আমার বড় ছেলের থেকেও ছোট। স্নেহ স্নেহ, বুঝলে হে মৈত্তির, স্নেহটাই আসলে আমার সাবকন্‌সাস্ মাইণ্ডে একটা ধ্যানের মতো কাজ করেছে। তা না হলে এ রকম কখনও হতে পারে।

সলিলও যেন বাঁড়ুয্যের মতোই মুখখানি অমায়িক করে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিলো, আর মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে শীতেশকে দেখছিলো। শীতেশ খানিকটা অবুঝের মতো বাঁড়ুয্যের দিকে তাকিয়ে ছিলো এবং ও-ও এক আধবার সলিলের মুখের দিকে দেখছিলো।

সলিল প্রায় গলা কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো বাঁড়ুয্যেদা?

বাঁড়ুয্যে শীতেশের দিকে মুগ্ধ চোখ রেখে বললেন, ওই যে বললাম, একটা বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেছে মিঃ রায়ের জন্য। তুই তো জানিস সলিল, চটকলে কাজ করি বটে, কিন্তু পড়াশুনা নিয়ে

থাকতেই ভালোবাসি। অভ্যাসটা জেলে থাকতেই হয়েছিলো।

সলিল বলে উঠলো, আপনি জেলও খেটেছেন বাঁড়ুয্যেদা?

বাঁড়ুয্যে তার চোখ দুটি প্রায় ধ্যানস্থের মতো বুজিয়ে ফেললেন, মুখে একটি অনির্বচনীয় হাসি। বললেন, তাও খেটেছি রে মৈত্তির, তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে, তোরা তখন জন্মাসনি। আমরা অবিশ্যি ওঁকে বাপুজী বলতাম। উনি আবার আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন···।

সলিল টিপ করে একটা প্রণাম করলো বাঁড়ুয্যের পায়ে। বাঁড়ুয্যে বললেন, জয়স্তু।

সলিল বললো, আপনার এই পরিচয়টা আমার জানা ছিলো না দাদা।

শীতেশের মনে পড়ে গেল, তালুকদারের কথা, একটা ফেরেববাজ, আর একটা গুলবাজ। সলিলের প্রণাম করা দেখে, ওর প্রায় হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, সাহস পেলো না। তালুকদার কি বিশেষণ দুটো সত্যি দিয়েছিল? ও বাঁড়ুয্যেকে বললো, আচ্ছা, আমি একটু ওদিকে দেখছি।

বলে, পা বাড়াবার উদ্যোগ করতেই, বাঁড়ুয্যে হাত তুলে বললেন, আসল কথাটা বলা হয়নি মিঃ রায়। কাল মিল থেকে ফিরে, হাত মুখ ধুয়ে জপে বসেছিলাম। ওটা আবার আমার রোজই চাই কী না। জপের পরে চা জলখাবার খেয়ে বইপত্তর নিয়ে বসেছি, এমন সময় আমার বড় ছেলে এলো। এমনি দু-চার কথার মধ্যে হঠাৎ বললে, পিশিমার বাড়ির দোতলার ভাড়াটেরা আজ চলে গেল। আশ্চর্য, ভগবানের কী লীলা, শোনামাত্রই আমার ভেতরে যেন একটা কিসের সেন্স ফিরে এলো। মনে পড়ে গেল, মিঃ রায়ের কথা···।

সলিল জিজ্ঞেস করে উঠলো, পিশিমাটা কে বাঁড়ুয্যেদা?

আমার ছোট বোন, আমার বাড়ির পাশেই তো আমার ছোট বোনের বাড়ি। ছেলেমেয়েরা সব সময়েই তাদের পিশিমার বাড়ি যাতায়াত করে। কথাটা শুনেই আমি সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোনের

বাড়ি গেলাম। আমি আবার জরুরি কাজ ফেলে রাখতে পারি না। গিয়ে শুনলাম কথাটা সত্যি, কিন্তু ছোট বোন কলেজের এক প্রফেসরকে নাকি ভাড়া দেবে বলে কথা দিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, তা হতে পারে না। অমন দক্ষিণ পুব খোলা দোতলার ফ্ল্যাট আমি মিঃ রায়ের জন্য চাই। বোন বললে, সে আগাম ভাড়া নিয়ে নিয়েছে। আমি তখনই সেই আগাম টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম, আর নিজে মিঃ রায়ের জন্য বোনকে আগাম টাকা দিয়ে দিলাম।

শীতেশ অসহায় বিস্ময়ে বললো, আগাম ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন? আমার জন্য ?

বাঁড়ুয্যে উদার অমায়িক হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে, ও কিছু না। বুক করে ফেলা নিয়ে কথা, বুক করে ফেললাম।

এই সময়ে সলিল আবার বাঁড়ুয্যের পায়ে একটা প্রণাম করে বললো, দাদা আপনার মতো এমন গ্রেট—।

বাঁড়ুয্যে বললেন, জয়স্তু। যা-ই হোক —।

তালুকদারের খ্যাঁকানি শোনা গেল, কী হচ্ছে কী এখানে, অ্যাঁ? কাজকর্ম সব লাটে উঠে গেছে নাকি ? মিঃ রায়কে কী বোঝানো হচ্ছে শুনি ?

সলিল বললো, মিঃ রায়ের জন্য—।

তালুকদার আরো জোরে খেঁকিয়ে উঠল, য়ু গেট আউট অব মাই সাইট।

সলিল বললো, ও. কে. স্যার, কিন্তু আমি কিছু বলিনি, বাঁড়ুয্যেদা—।

কথাটা শেষ না করেই সে হনহন করে চলে গেল। বাঁড়ুয্যের মুখের হাসিটি এখন অস্বস্তিতে ভরা। বললেন, মিঃ রায়ের জন্য একটা বাড়ি পাওয়া গেছে।

শীতেশ এতক্ষণে বলবার সুযোগ পেলো, কিন্তু শুনুন মিঃ ব্যানার্জি, আমার বাড়ি দেখবার জন্য মিঃ চৌধুরি বড়বাবুকে বলে দিয়েছেন,

আর সেটাও দু-এক দিনের মধ্যেই নাকি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি কেন শুধু শুধু আমার হয়ে আগাম ভাড়া দিতে গেলেন ?

তালুকদার রুক্ষ জিজ্ঞেস করলো, কে আগাম ভাড়া দিয়েছে, বাঁড়ুয্যেমশাই !

বাঁড়ুয্যে হেসে বললেন, সেটা কিছু না। কিন্তু বড়বাবু মানে চক্রবর্তী, ভদ্দরলোকের পাড়ার কিছু জানেন না। আমি মিঃ চৌধুরিকে নিজে বলে দেবো 'খন, ওর জন্য আপনি ভাববেন না মিঃ রায়। পুব-দক্ষিণ খোলা দোতলা ফ্ল্যাট, বিরাট ব্যালকনি গ্রীল দিয়ে ঘেরা—।

তালুকদার তাঁকে কথা শেষ করতে দিলো না, এখন ওসব রাখুন বাঁড়ুয্যেমশাই, যান, নিজের কাজ দেখুন গে। যা বলবার ছুটির পরে বলবেন।

তা যা বলেছেন, তা যা বলেছেন। কাজটাই হলো আগে। আচ্ছা মিঃ রায়, পরে কথা বলছি। বলতে বলতে বাঁড়ুয্যে চলে গেলেন।

তালুকদার শীতেশকে ডাকলো, আসুন।

শীতেশকে নিয়ে সে কাঠের পার্টিশনে ঢুকে সিগারেট ধরালো। তারপরে শীতেশকে জিজ্ঞেস করে সব শুনলো, প্রথমেই বললো, সবটাই গুল্। বাঁড়ুয্যের বোনের বাড়ি আমি দেখেছি, পাশাপাশি ভাই বোনের বাড়ি। পুরনো বাড়ি। সরু গলি রাস্তা, দু'পাশে খাটা পায়খানার খোলা দরজা, ইম্‌পসিব্‌ল। আসলে খালি পড়েই ছিলো, আপনাকে ঢুকিয়ে ঘাড় ভাঙবার চেষ্টা। গুল্‌বাজ বুড়োর আর কোনো মতলব থাকলেও, আমি মোটেই অবাক হবো না।

শীতেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আর কী মতলব থাকতে পারে ?

বুড়োর কম করে হাফ ডজন মেয়ে আছে, একটারও বিয়ে হয়নি। আপনার ঘাড়ে যদি একটাকে গছাতে পারে, মন্দ কী।

শীতেশের শিরদাঁড়া আবার কেঁপে উঠলো। চৌধুরির কন্যাদের

কথা ওর মনে পড়ে গেল। কন্যাদের না, সেই ভয়ংকর লীনা।
তালুকদার শীতেশের পিঠ চাপড়ে বললো, আরে এত ভাবছেন কেন, আপনি তো আর বাঁড়ুয্যের বোনের বাড়িতে ভাড়া যাচ্ছেন না, মেয়ে গছাবারও নো কোয়েশ্চেন। তবে হ্যাঁ, সাবধানের মার নেই। নিন, সিগারেট খান একটা।

তালুকদারের কথা শেষ হতে না হতেই, প্রায় বুকের নিচেই প্যান্টের বেল্ট বাঁধা, লেবার অফিসার ঘোষাল ঢুকলেন। মোটা ভুরুর নিচে সেই ড্যাবরা চোখ, কলসীর জল ঢালার মতো বগবগিয়ে উঠলেন, গুডমর্ণিং ভাই, গুডমর্ণিং।

তালুকদার বলে উঠলো, আরে ঘোষাল সাহেব—আসুন আসুন, কী মনে করে?

আমার ডিপার্টমেন্ট কোনো হাঙ্গামা বাধিয়েছে নাকি?

ঘোষাল হাসতে হাসতে, গোঁফে তা দিয়ে বললেন, না না, ওসব কিছুই না। তোমাদের সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম, স্পেশালি আমাদের নতুন ওভারসিয়ার সাহেবকে একবার দেখতে এলাম। কী রকম লাগছে মিঃ রায়?

শীতেশ বললো, ভালোই তো।

তালুকদার বললো, দাঁড়ান ঘোষাল সাহেব, আরো কিছুদিন যেতে দিন, তারপরে তো বোঝা যাবে।

তা ঠিক, তা ঠিক। আমি আবার চিত্তবাবুর মুখে শুনলাম, রায় নাকি ডাক্তারের কাছে গেছলো। ভাবলাম খবরটা নিয়ে আসি, কোনো অসুখ করলো নাকি।

তালুকদার জানতো না, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তা-ই নাকি?

শীতেশ তাড়াতাড়ি বললো, না না, সে এমন কিছু না।

ঘোষাল বললেন, আমিও তাই ভাবলাম, বোধহয় রাত্রে ঘুম-টুম হয়নি, তা-ই শরীরটা একটু বেভাব মতো হয়েছে। ঘুম হবেই বা কী করে, রাত্রি থাকতে উঠে ট্রেন ধরে এত দূরে এসে চটকলে কাজ করা পোষায়? যা-ই হোক, মিঃ রায়, আপনি ভাববেন না, চিত্তবাবুকে

আপনার বাড়ি দেখতে বলে দিয়েছি। বলে দিয়েছি দরকার হলে, লাঞ্চের পরে অফিসে আসতে হবে না, কিন্তু আজকের মধ্যে, বেশ ভদ্রপল্লীতে একটা বাড়ি চাই-ই চাই।

শীতেশ আর তালুকদার চোখাচোখি করলো। ঘোষাল আবার বললেন, আমি অবিশ্যি ভাবছি, আমাদের এই মিল পাড়াতেই বাড়ি পাওয়া গেলে ভালোই হয়, তা হলে কাছাকাছি থাকা যায়, রায়কে একটু দেখাশোনাও করা যাবে।

আবার দেখাশোনা! শীতেশের শিরদাঁড়ায় ঢেউ খেলে গেল। তালুকদার বললো, সে তো ঠিক কথাই।

ঘোষাল শীতেশের দিকে ফিরে বললেন, কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি। ওদিকে দয়াল ছুতোরকেও বলেছি, সে যেন আলমারি খাট চেয়ার ড্রেসিং টেবল সব রেডি করে রাখে। কিছু ভাববেন না। আচ্ছা, আমি এখন চলি, অফিস ছেড়ে দু'মিনিট বেরোবার উপায় নেই। চলি, অ্যাঁ?

তালুকদার আর শীতেশ দুজনেই ঘাড় নাড়লো। ঘোষাল চলে গেলেন। তালুকদার আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে, ভুরু কুঁচকে পায়চারি করতে লাগলো। শীতেশ তা-ই দেখতে লাগলো। তালুকদার পায়চারি করতে করতেই বললো, ব্যাপারগুলো মোটেই সুবিধার ঠেকছে না। বাঁড়ুয্যে বাড়ি দেখছে, ঘোষালও দেখছে, কাছাকাছি রাখতে চাইছে, যাতে দেখাশোনা করা যায়। ঘোষালেরও তিন চারটি আন্‌ম্যারেড মেয়ে আছে।

শীতেশ চোপসানো স্বরে বললো, মিঃ ঘোষাল গতকাল আমার খোঁজ-টোজ নিচ্ছিলেন, আমি রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কী না, বিয়ে করেছি কী না—।

তালুকদার বলে উঠলো, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। যা ভেবেছি তা-ই।

শীতেশ আবার বললো, মিঃ চৌধুরিও বড়বাবুকে বাড়ির জন্য লাগিয়েছেন, শুনলাম। অবিশ্যি মিসেস চৌধুরি গতকাল বলছিলেন,

লোকেরা নিন্দে করবে, তা না হলে তাঁদের কোয়ার্টারেই তিনি আমাকে রেখে দিতেন।

তালুকদার একেবারে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপরে উদ্বিগ্ন গম্ভীর স্বরে বললো, ওহ্ ভাই রায়, আপনি তো বাঘের থাবার নিচে শুয়ে আছেন, আপনাকে বাঁচাবার কোনো উপায় নেই।

শীতেশ নিচু স্বরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, বাঘের থাবার নিচে?

হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট। ওরে ফাদার, আমি ভাবতেই পারছি না। বলেই আবার পায়চারি করতে লাগলো। আর কপালে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে আপন মনেই বলতে লাগলো, কিন্তু একটা ওয়ে আউট চাই।

শীতেশ বললো, আমার দাদা অবিশ্যি একটা ম্যানেজের কথা বলেছিলো—।

ম্যানেজারের ওপরে ম্যানেজারি? ও কোনো দাদার কর্ম না। তবু শুনি?

শীতেশ দাদার মতলবের কথা বললো। তালুকদার বললো, মানে আপনি এনগেজ্ড এটাই জানাতে হবে। কাজে লাগতে পারে, কিন্তু চৌধুরির অপত্য স্নেহ হারাতে হবে। তবু বোধহয় চৌধুরি ছাড়বে না, খুনের চেষ্টা চালাবে।

খুন!

মানে ওই আপনাকে। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে যাবার ব্যাপারটা কী?

শীতেশ ঘটনা ব্যক্ত করলো এবং সেই সঙ্গে গতকাল চৌধুরির কোয়ার্টারের সব ঘটনা জানালো। তালুকদার হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়লো। মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, আমি গীতার কৃষ্ণের মতো দেখতে পাচ্ছি, আপনি মৃত।

মৃত?

হুঁ মৃত, ডেড, য়ু আর ডেড মিঃ রায়, এ ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারছি না।

শীতেশের মনে হলো, ও সত্যি মারা গিয়েছে। এবং মৃতবৎ চেয়ারে বসে রইলো।

তালুকদার বললো, অবিশ্যি আমার ওয়াইফের সঙ্গে আজ লাঞ্চের সময় আমি একটু পরামর্শ করে দেখব। এসব ব্যাপারে ওদের বুদ্ধি আমাদের থেকে বেশি। দেখি ও কোনো পথ বাতলাতে পারে কী না। তবে মিঃ চৌধুরি যে বাড়ির ব্যবস্থা করবেন, সেই বাড়িতেই আপনাকে যেতে হবে, ওসব বাঁড়ুয্যে ঘোষাল-টোষাল টিঁকবে না। আর চৌধুরি ফ্যামিলি, স্পেশালি হিজ এলডার ডটার—ছ্যাট শী-এলিফ্যান্ট আপনাকে দেখাশোনাও করতে যাবে এবং খুব তাড়াতাড়িই আপনাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করা হবে, ইয়েট, তার আগেই একটা কিছু ভেবে দেখতে হবে।

শীতেশ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, মিঃ তালুকদার—

তালুকদার শীতেশের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, এতটা ঘাবড়াবেন না! একটা কিছু ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, এখানে কারোকে একটা কথাও বলবেন না। এখন চলুন, ডিপার্টমেণ্টে যাওয়া যাক একটু।

শীতেশ মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালো।

বেলা এগারোটায় চৌধুরির কোয়ার্টারে যেতেই সমস্ত পরিবার যেন উদ্বেগে আছড়ে পড়লো শীতেশকে ঘিরে। তারপরে শীতেশের চেহারা দেখে এবং যখন শুনলো, তেমন কিছু অসুখ না, তখন কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মিসেস এবং মীনা চলে গেল। লীনার চোখে তখনো উদ্বেগ এবং প্রায় ব্যথার অভিব্যক্তি। বললো, বাবার টেলিফোনে যখন অসুখের খবর পেলাম, আমার বুকটা কেমন করছিল। বলতে বলতে লীনা তার বিপুলায়তন বক্ষে আঁচলটা তুলতে গিয়ে, আবার

নামিয়েই ফেললো। শীতেশের মনে হলো, লীনা বোধ হয় কেঁদে ফেলবে। তখন যে কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না। কিন্তু লীনা কাঁদলো না, প্রেমপূর্ণ করুণ চোখে শীতেশের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। শীতেশের মনে হলো, ও আবার মরে যাচ্ছে। তারপরে খেতে বসে হলো চরম দুর্ভোগ, যদিও তার আগেই, এক ফাঁকে ঝণ্টু বলে গিয়েছিল, ঠিক জিমির খাবারের মতো আপনার মাংস রান্না হয়েছে।

শীতেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, জিমি কে?

কুকুর—আমাদের জিমি। ওকে তো মশলা দেওয়া হয় না।

শীতেশ সুস্থ শরীরে, প্রথমে খেলো এক পেয়ালা লেবুর রস দেওয়া গরম বার্লি। তারপরে ঠিক যেন বার্লিতে ডোবানো, দু'টুকরো ছোট ছোট মাংস, কয়েক টুকরো গাজর। আর মাত্র এক পিস্ শুকনো টোস্ট, তাতে মাখনও মাখানো নেই। তারপরেও মিসেস চৌধুরি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, শরীরটা খারাপ থাকলে আজকের রাত্রিটা না হয় শীতেশ থেকেই যাক। ওর দাদাকে একটা টেলিফোন করে দিলেই হবে। আতঙ্কে বুক গুরগুরিয়ে উঠলো শীতেশের।

মরিয়া হয়ে জানালো, সে-রকম কোনো অসুখই ওর করেনি। চৌধুরিও সেটা মেনে নিলেন, যদিও লীনা মীনা ধুনোর গন্ধ ছড়াবার চেষ্টা করেছিল।

শীতেশ চৌধুরির বাড়ি থেকে বেরুলো প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে, বেলা দুটো নাগাদ। ডিপার্টমেন্টে ঢোকা মাত্র তালুকদার ওকে নিয়ে ঢুকলো পার্টিশানের মধ্যে। শীতেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি লাঞ্চে যাননি?

তালুকদার বললো, গেছলাম, কিন্তু ভালো করে খাওয়া হয়নি। আপনার বিষয় নিয়েই আমার ওয়াইফের সঙ্গে ডিসকাশন হলো। আপনার বিপদের কথা ভেবে আমরা দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। যা-ই হোক, মোটামুটি প্ল্যান ঠিক করা গেছে।

তালুকদারের এই অত্যুৎসাহ দেখে শীতেশ আবার নতুন করে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো, কী প্ল্যান?

তালুকদার বললো, আমার ওয়াইফের মতে আপনাকে হতে হবে ইমমর‍্যাল—লুজ ক্যারেকটর। মানে অসচ্চরিত্র লম্পট বদমাইস।

শীতেশ উদ্বিগ্ন অসহায় ভাবে বললো, তা কী করে হবো।

তালুকদার বললো, আরে আপনি তো আচ্ছা লোক। সত্যি সত্যি কি আর আপনি লম্পট হবেন নাকি? অ্যাট্ প্রেজেন্ট আপনাকে তা-ই হতে হবে, মানে সাজতে হবে। সবাই যেন ভাবে, আপনি একটা চরিত্রহীন লম্পট বদমাইশ। আপনি ড্রিংক করেন?

প-প-পরশু রাত্রে একটু বীয়র খেয়েছিলাম।

সারা জীবনে?

হ্যাঁ।

তা হোক। লোককে জানাতে হবে, আপনি একটা মাতাল।

মাতাল? আমি তো মদ খেতে পারবো না।

তালুকদার চটকলের সাহেবদের মতো একটা টিপিকাল খিস্তি করে বললো, আরে মশাই, মদ খেতে কে বলেছে আপনাকে? ঘোষাল বাঁড়ুয্যে চৌধুরি, সবাই যেন জানে, আপনি চরিত্রহীন লম্পট মাতাল। ওঁরা এটা জানতে পারলেই আপনি বাঁচবেন। দিস ইজ দ্য ওনলি অ্যাডভাইস অব মাই ওয়াইফ। কেন না মাতাল দুশ্চরিত্রের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে না।

শীতেশের মনে হলো, কথাটার মধ্যে একটা যুক্তি আছে। জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু সেটা প্রমাণ করবো কি করে?

তালুকদার বললো, সেটা অবশ্যি ভেবে দেখতে হবে। তবে হুইসপারিং ক্যাম্পেন এখন থেকেই চালিয়ে যেতে হবে। এক নম্বর হচ্ছি আমি, দু'নম্বর ভাবছি সলিল মৈত্রকে লাগাব। ও বেশ তেএঁটে বদমাইশ আছে।

শীতেশ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি করবেন আপনারা?

আমরা ক্যাম্পেন চালিয়ে যাবো, আপনি একটা দুশ্চরিত্র মাতাল। কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে আপনাকে ঢুকতে দেওয়াই উচিত না।

আতঙ্কিত শীতেশ আর্তনাদ করে উঠলো, অ্যাঁ? না না মিঃ তালুকদার, এমন কাজ করবেন না। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের ছেলে আমি, মুখ দেখাতে পারবো না। আমার বাবা দাদা কী ভাববেন।

আরে ব্রাদার, ব্যাপারটা তো আর সত্যি না।

না না মিঃ তালুকদার, লোকে একবার বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে, আমি বাঁচবো না। বাসা ভাড়া জুটবে না, হয়তো চাকরি নিয়েও টানাটানি হবে।

মোটেই না, চাকরি নিয়ে কিছুই হবে না। অসচ্চরিত্র লোকদের মোটেই চাকরি যায় না। আর—আচ্ছা, ঠিক আছে, বাসা ভাড়া হয়ে যাবার পরে ক্যাম্পেন স্টার্ট করবো, তা হলেই হবে।

শীতেশ অসহায় আর্ত নিচু স্বরে বললো, মিঃ তালুকদার, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আর একটু দেখুন, হঠাৎ একটা কিছু করে বসবেন না, প্লিজ—

তালুকদার ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে বললো, আমার আর কি। লীনা মুটকিকে যদি আপনার ভালো লাগে, বিয়ে করুন গে। আর ঘোষাল আর বাঁড়ুয্যের মেয়েদের তো এখনও দেখেননি। চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

শীতেশ বললো, না না, ওসব আমি করবো না। আপনি খালি কয়েকটা দিন একটু দেখে নিন, পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায়।

তালুকদার বললো, ঠিক আছে! আমার আর কী, কাঠ খাবেন, আংরা ছাড়বেন। তবে জেনে রাখুন, আপনার পেছন ওরা ছাড়বে না, আমার প্ল্যানও আমি ছাড়ছি না। তবে কয়েকদিন দেখবো। এখন চলুন, কাজ করা যাক।

শীতেশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কাজ করতেই তো ও এসেছে। ভবিষ্যতে ওর কতো আশা। কিন্তু ঘটনার গতি যে এমন হবে, কে জানতো।

পাঁচ দিনের দিনে বাড়ি পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, বড়বাবু লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তীর যোগাড় করে দেওয়া বাড়িতেই শীতেশের বাস করা স্থির হয়েছে। শীতেশ নিজেও দেখেছে, বাড়িটা ওর পছন্দই হয়েছে। পাড়াটা ভালোই এবং ভদ্র। পাড়ায় খোলা মেলা ছোট খাট মাঠ পুকুর আছে। গঙ্গা খুব সামনে।

নতুন বাড়ির দোতলায়, পাশাপাশি দু'খানি ঘর। পূব দক্ষিণ খোলা। রান্নাঘর বাথরুমও খারাপ না। ভাড়া একশ পঁচিশ টাকা। বাড়িওয়ালা থাকেন পাশেই। নতুন বাড়ি সংলগ্ন, তাঁদের পুরনো বাড়িটি বিরাট। কয়েক ভাই শরিক হিসাবে ভাগাভাগি করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে যিনি মধ্যম, তিনিই এ নতুন বাড়িটি করেছেন। তাঁর অবস্থাও ভালো। তাঁদের পদবী হড়, অথচ নাকি ব্রাহ্মণ। কোনো ব্রাহ্মণের এরকম পদবী শীতেশ কখনও শোনেনি।

চৌধুরি সাহেব স্বয়ং গিয়ে বাড়িটি দেখে এসেছেন এবং পছন্দ করেছেন। আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেছেন বড়বাবু। সবই ভাড়া নেওয়া হয়েছে, খাট টেবিল চেয়ার আলমারি ওয়ারড্রোব ইত্যাদি। কেননা, কোয়ার্টার পাবার পরে, অনেক দামী আসবাবপত্র মিলবে, কেনার কোনো দরকার নেই। চাকর এবং একই সঙ্গে পাচকও পাওয়া গিয়েছে। চৌধুরি পরিবারের সবাই এসে ঘর দরজা সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে লীনা।

কলকাতা থেকে ছুটির দিনে বৌদিরও দাদার সঙ্গে আসার কথা। কিন্তু সেখানেও গোলমাল। সরস্বতী তার পিশতুতো বোনের ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না। তার ইচ্ছা দেরি না করে, সামনের মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক। এ ব্যাপারে নীতিশ এবং শীতেশের, দুজনেরই আপত্তি। ফলে, বিবাদ, অভিমান বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। একমাত্র নীতিশের মাথাটাই বোধহয় ঠাণ্ডা আছে। অগ্রিম বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে শীতেশের টাকা পয়সার ব্যবস্থা সে-ই করেছে এবং শীতেশকে উপদেশ দিয়েছে, ও যেন সাবধানে সব দিক মানিয়ে চলে। যদিও শীতেশের ধারণা, ওর পক্ষে মাথা ঠিক রেখে চলা অসম্ভব।

তথাপি শীতেশ খানিকটা স্থিতি লাভ করলো, কলকাতা থেকে রোজ ভোররাত্রে ছুটোছুটির হাত থেকে। যদিও বৌদি না আসাতে ও মনে খুবই দুঃখ পেয়েছে। নীতিশ বলেছে, কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিপদগুলো দেখা দিতে লাগলো অন্য দিক থেকে। লেবার অফিসার ঘোষাল শীতেশের সঙ্গে আলাদা দেখা করে জানিয়েছে, হড়েরা, অর্থাৎ শীতেশের বাড়িওয়ালা পরিবার বড়বাবু লক্ষ্মীকান্তর আত্মীয়। বড়বাবুর নিজের কোনো মেয়ে নেই। কিন্তু গোটা হড় পরিবারে, কম করে তেরো-চৌদ্দটা অবিবাহিতা মেয়ে আছে, যারা বিবাহযোগ্যা। সেইজন্যেই লক্ষ্মীকান্ত হড়দের নতুন বাড়িতে, বিশেষ করে, মধ্যম হড় যেহেতু বড়বাবুর সম্বন্ধী এবং সম্বন্ধীর নিজেরই কয়েকটা মেয়ে রয়েছে, অতএব তার নতুন বাড়িতেই ব্যবস্থা করেছে। লেবার অফিসার ঘোষাল অবিশ্যি একথাও বলেছেন, তবে শীতেশ যেন দুশ্চিন্তা না করে। তিনি থাকতে, হড়দের মেয়ে কিছুতেই শীতেশের ঘাড়ে গছাতে দেবেন না।

বাঁড়ুয্যেও একই কথা একটু অন্যরকম ভাবে বলেছেন। এই হড়বংশ নাকি অতীতে ছিল ডাকাতের বংশ। বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের ঠাকুর্দা নাকি বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং তিনিই হড় পরিবারকে শাসন করেন, শোধন করেন। কারণ উনি শাস্তি দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। পুলিশ অফিসার হলেও, উনি নাকি ছিলেন ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তখনকার সময় ইংরেজ লাট বাহাদুর স্বয়ং ঠাকুর্দাকে স্নেহ করতেন এবং আদর করে বিশু বলে ডাকতেন, তাঁর নাম ছিল বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাগুলো সলিল মৈত্রের সামনেই বলেছিলেন এবং সলিল যথারীতি ওঁকে প্রণাম করেছিল, উনিও 'জয়স্তু' বলেছিলেন। তারপর বাঁড়ুয্যেমশাই আসল কথাটি বলেছিলেন, মিঃ রায়, আপনার কপালের দিকে তাকালে আমি যে জ্যোতি দেখতে পাই, জানবেন ওখানে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হয়েছে। হড়েরা যত খারাপই হোক, আপনার কোনো অমঙ্গল ওরা করতে পারবে না। আমার বিয়ের জন্য

না হোক পাঁচশো মেয়ের বাবা ফেউয়ের মতো লেগেছিল, কিন্তু দেখুন, আমার কপালের দিকে তাকিয়ে দেখুন, অনেকটা আপনার মতোই জ্যোতি দেখতে পাবেন। আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন স্বয়ং সি. আর. দাশ—

শীতেশ থতিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কে সি. আর. দাশ?

বাঁড়ুয্যে হেসে বলেছিলেন, দেশবন্ধু। কারণ ওই সময়টা আমি ওঁর সঙ্গেই দেশসেবা করছিলাম। আমি, নেতাজী, ডঃ বিধান রায়, প্রফুল্ল ঘোষ। আমার স্ত্রী আবার রবিঠাকুরদের কী রকম আত্মীয়।

সলিল আবার প্রণাম করেছিল এবং উনি 'জয়স্তু' বলেছিলেন। শীতেশের ইচ্ছা করেছিল. ও-ও একটা প্রণাম করে। ভরসা পায়নি। তবে মাসখানেকের মধ্যেই, ঘোষাল এবং বাঁড়ুয্যের বাড়িতে শীতেশকে এক রাত্রি করে নিমন্ত্রণ খেতে হয়েছে। উদ্দেশ্য কন্যাদর্শন এবং পরিচয়াদি ঘটানো। ঘোষালের কন্যা রোগা ছিপছিপে হাড্ডিসার, সুস্পষ্ট গোঁফ আছে এক জোড়া। বয়স বোধহয় শীতেশের থেকেও বেশি। আর বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের কন্যার বয়স খুব মেরে কেটে চৌদ্দ-পনেরো হতে পারে। দেখতে শুনতে মন্দ না। কিন্তু তার চোখে মুখে কথা। এমন পাকা পাকা কথা শীতেশ জীবনে কোনোদিন শোনেনি।

অন্য দিকে লীনা মীনার যাতায়াত প্রায় নিয়মিতই আছে। বিশেষ করে লীনা। শীতেশের একটাই মাত্র সান্ত্বনা, যে ছেলেটি ওর কাজ এবং রান্না করে, সে যেন কেমন ভাবে শীতেশের দুরবস্থাটা বুঝে গিয়েছে। কারণ একদিন ছুটির পরে, বাড়ি ঢোকবার মুখেই দেখলো রাধিকা দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটির নাম রাধিকা। ও শীতেশকে দেখেই গলা নামিয়ে বললো, চৌধরি সাহেবের বড় মেয়ে এসে বসে আছে।

শীতেশ রাধিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে বুঝে নিলো ব্যাপারটা। বললো, আমি তা হলে ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসি। বলেই ও গঙ্গার ধারের দিকে পালিয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে এরকম ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। ওদিকে তালুকদারকে আর সামলে রাখা

যাচ্ছে না। সে তার হুইসপারিং ক্যাম্পেন প্রায় শুরু করে দিয়েছে, তা না হলে নাকি শীতেশকে বাঁচানো যাবে না।

এসব ছাড়াও, হড়দের বাড়ির কর্তারা প্রায়ই এসে শীতেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যান। এমন কি পাড়ার কোনো কোনো ভদ্রলোকও। নীতিশের কাছে কয়েকটি চিঠিও এখান থেকে গিয়েছে, বিয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব করে। সব থেকে বিড়ম্বনার বিষয়, পাড়ার কোনো কোনো মেয়েও রীতিমত অগ্রসর হচ্ছে, একটু হাসি, একটু গানের কলি গেয়ে ওঠা। যার ফলে তাঁদের পিতারা শীতেশের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

শীতেশ এক এক সময় চুপচাপ ভাবে, সমাজের এই মর্মন্তুদ এবং করুণ চেহারাটার কথা ওর আগে কখনো মনে হয়নি। অথচ একটি যুবক হিসাবে, ওর কী-ই বা করণীয় আছে। আছে, করণীয় একটা ব্যাপারই আছে, তা হলো প্রেম। কারণ, শীতেশের নিজের ব্যাপারটাই ওর কাছে বিস্ময়কর লাগছে। একটি মেয়েকে কেন যেন ওর ভালো লাগছে।

হড়দের বাড়ির লাগোয়া একটি একতলা বাড়ি আছে। শীতেশের পশ্চিম দিকের জানালায় দাঁড়ালে, সেই বাড়ির সবটাই প্রায় দেখা যায়। উঠোন বারান্দা তো বটেই, অনেক সময় খোলা জানালা দিয়ে ঘরের দৃশ্যও। বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি এমনিতে যেমন রাশভারি, অন্যদিকে গম্ভীর এবং একটু অন্যমনস্ক ভাব। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, এত কাছে থেকেও, কখনো শীতেশের সঙ্গে আলাপ করেননি। শীতেশের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তিনি যেন অনবহিত। জানেনই না। রাধিকার মুখে শুনেছে, উনি নাকি এখানকার একটি হাইস্কুলের টিচার। কিছু কিছু ছেলেমেয়েকে তাঁর বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে আসতে দেখা যায়। নাম চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ওঁর বড় ছেলে বোধহয় কোনো বড় একটা চাকরি করে কলকাতায়। সেই হিসাবে, পরিবারটির অবস্থা খারাপ না। পুত্রবধূটি বেশ

আধুনিকা। বাড়িতে ছেলেমেয়ে কয়টি, শীতেশ সঠিক হিসাব করতে পারে না। সামান্য পরিচয় হয়েছে একমাত্র বড় ছেলেটির সঙ্গে। কিন্তু সেই বাড়িরই একটি বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে, শীতেশকে চুম্বকের মতো টানছে। ওর জীবনে এরকম একটা ব্যাপার এবং অনুভূতি একেবারে নতুন। ব্যাপারটা মনে মনে ভাবতেও ভয় লাগছে। কারোকে বলা তো দূরের কথা। অথচ মেয়েটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই ওর পরিচয় ঘটে গিয়েছে। সেটাও খুব অদ্ভুতভাবে এবং প্রায় একটা শঙ্কাজনক আকস্মিকতার মধ্যে। অন্ততঃ শীতেশের কাছে তো আকস্মিক বটেই।

প্রথম দিনের চমকটা কবে ঘটেছিল, শীতেশের ঠিক মনে নেই। তবে সেটা ছুটির দিন, সকালের ট্রেনেই কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই কী কারণে যেন, পশ্চিম দিকের জানালার পর্দাটা তুলেছিল। তুলতে প্রথমেই যা লক্ষ্য পড়েছিল, তা হলো, এক পিঠ চুল এলানো একটি মেয়ে, পিছন ফিরে বসে আছে একতলা ছাদের একধারে। ছাদের কোনো আল্‌সে নেই। সূর্য তখন সবে উঠেছে। কালো দীর্ঘ ভেজা ভেজা চুলের ওপর, সকালের প্রথম রোদের ছটা চিকচিক করছিল।

কেশবতীর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। পিছন ফিরে সে মাথাটা ঠেকিয়ে রেখেছিল হাঁটুতে। তার পরনে ছিল একটি লালপাড় শাড়ি, লাল রঙেরই একটি জামা। শরীরের অংশের মধ্যে, হাঁটু জড়িয়ে রাখা দু'হাতের ডানার অংশ বিশেষ এবং পিছনের জামা এবং শাড়ির কোমরের বন্ধনীর মাঝখানে সামান্য অংশ, যেখানে শিরদাঁড়ার রেখার মাঝখান থেকে, সকালের রোদের রঙের মতোই দুটি উপলখণ্ড দু'দিকে একটু উঁচু হয়ে, আবার ঢালুতে নেমে গিয়েছে। রঙটা শীতেশের সেই রকমই মনে হয়েছিল, ঠিক যেন সকালের রোদের মতো স্নিগ্ধ রঙ। ফরসা, কিন্তু যাকে বলে উজ্জ্বল-সুবর্ণপ্রভা তা না।

ব্যাপারটা যেন একটা দৈব অলৌকিক কিছু দর্শনের মতো। এমন একটি ছবি, যা হয়তো এমন কিছুই অসাধারণ না, কিন্তু শীতেশ চোখ

ফেরাতে পারেনি। প্রায় মিনিট খানেক দেখার পরে, শীতেশ যখন সরে আসবে ভাবছে, তখনই কেশবতীর মুখ পাশ ফিরলো। মুখের অন্য পাশ হাঁটুর ওপরে কাত করা। শরীরের থেকে মুখের বর্ণ একটু যেন উজ্জ্বলতর মনে হয়েছিল। সে ডান হাত দিয়ে, মুখ আর কপালের পাশ থেকে চুল সরিয়ে, তার গ্রীবা এবং কাঁধ অংশতঃ দৃশ্যমান করেছিল। স্বভাবতঃই চুলের অধিকাংশটাই এলিয়ে পড়েছিল বাঁদিকে।

সে তাকিয়ে ছিলো দূরের আকাশের দিকে। শীতেশের মনে হয়েছিল, দুটি ডাগর কালো চোখ যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙে তাকালো। কিন্তু বোধহয় রোদের জন্যই তার ভুরু একটু কুঁচকে গিয়েছিল, যেমন ঘুমন্ত চোখে হঠাৎ আলো পড়লে হয়। টিকলো নাকের একটি পাশ রক্তিম ঠোঁটের একটু অংশ, চিবুকের নীচে ছায়া, গ্রীবায় রোদের ঝিলিক, সব মিলিয়ে একটি মন-টলটলানো ছবি। কিন্তু শীতেশের তখন মনে ভয় ধরেছে। কোনো কারণে ওর দিকে যদি জীবন্ত ছবিটির চোখ পড়ে যায়, তা হলে আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না।

এই ভেবে শীতেশ যখন সরে আসতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই ছবিটি হেসেছিল নিঃশব্দে। তার ঝকমকে সাদা দাঁত একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাসিটা মিলিয়ে যায়নি, ঠোঁট টিপে হাসছিল। শীতেশ প্রায় চমকেই গিয়েছিল। কার দিকে চেয়ে ছবির সেই হাসি! চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল, দৃষ্টি তার শীতেশের জানালার দিকে না, বরং একটু উত্তর দিকে, অনেকটা মুখোমুখি। তারপরেই ওর কানে গিয়েছিল একটি মেয়ের স্বর, এত সকালেই চান করেছিস?

ছবি মুখ ফুটে কিছু বলেনি। সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়েছিল। নিশ্চয়ই হড়দের বাড়ির কোনো মেয়ে, দোতলার জানালা বা ছাদ থেকে কথা বলছিল, কিন্তু সেই অংশ শীতেশের চোখে ছিল অদৃশ্য

আবার মেয়ে-স্বরে জিজ্ঞাসা শোনা গিয়েছিল, শ্যাম্পু ঘসেছিস বুঝি?

ছবির সেই একই অভিব্যক্তিতে, নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে সায় জানানো।

জিজ্ঞাসা আবার শোনা গিয়েছিল, কোথাও যাবি বুঝি?

ছবিটি তখন আর একভাবে থাকতে পারেনি। দু'হাতে চুল তুলে পিঠে একটু আছড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। শাড়িটি পরা ছিল আটপৌরে ভাবে। সে লালপাড়ের আঁচল তুলে দিয়েছিল তার স্বাস্থ্যোদ্ধত বুকে, যদিও তেমন উদ্ধত বলা যায় না, একটি বিনম্র ঢেউয়ের মতো সেই বুক। চেহারার সঙ্গে মানানসই। শীতেশ চকিতের জন্য চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। এভাবে কোনো মেয়েকে দেখাটা ওর স্বভাবে নেই। তবু চোখ না তুলে পারেনি। কেননা তার সেই সম্পূর্ণ মুখ এবং ডাগর কালো চোখ এবং ঠোঁটের হাসি থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। ছবিটি কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল, হড়দের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কলকাতায় যাব মামাবাড়িতে মায়ের সঙ্গে।

অন্যদিকের কথা শোনা গিয়েছিল, কখন ফিরবি?

ছবির জবাব, কাল।

অন্যদিক: কাল কলেজ কামাই করবি?

ছবি: কী করব। একটা রাত্রি থাকতেই হবে। দিদিমার অবস্থা ভালো না।

তারপরেই ছবির ঠোঁটে একটু বাঁক লেগেছিল, নাকে একটু কুঞ্চন। বলেছিল, কাল তেমন কোনো ক্লাসও নেই। একমাত্র ভোম্বলদাস বোস মহাশয়ের হিস্ট্রির ক্লাস আর সেই ফিল্মস্টার মার্কা লেকচারার ব্যানার্জির ইকনমিক্স। দুটোর কারোর ক্লাসই আমার করতে ইচ্ছে করে না।

অন্যদিক থেকে খিলখিল হাসি শোনা গিয়েছিল। আর শীতেশ মনে মনে ভোম্বলদাস আর ফিল্মস্টার মার্কার কথা ভাবছিল। ছবিটি যে সে মেয়ে না।

অন্যদিকের প্রশ্ন: ভোম্বলদাস মানে দিলীপবাবুর কথা বলছিস তো?

ছবির জবাব : আবার কে? ব্যানার্জিকে তো তোদের আবার খুব ভালো লাগে।

অন্যদিক : তা যা-ই বলিস, ব্যানার্জি বেশ হ্যাণ্ডসাম, চুল টুলগুলো ঠিক নায়কের মতো। কথা বলার স্টাইলটা দারুণ।

ছবি : আমার তো ওকে বুদ্ধু বলে মনে হয়।

অন্যদিক : কেন?

ছবি : ব্যানার্জিরও ধারণা ও বুঝি সত্যি নায়ক, সব ছাত্রীরা ওকে দেখে পাগল।

অন্যদিক আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল! আর শীতেশ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবছিল, কলেজের অধ্যাপকদের নিয়ে এই সব আলোচনা হচ্ছে?

অন্যদিক : তুই হলি রূপসী মেয়ে, ব্যানার্জিকে তোর চোখে লাগবে কেন?

ছবি : মোটেই না। আমি কোনো প্রফেসরকে নিয়ে ওসব ভাবি না। কারোকে কারোকে ভালো লাগে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ব্যানার্জির ওসব ফিল্‌মি কায়দা আমার বিচ্ছিরি লাগে। লোকটা পড়াতেও পারে না। কিন্তু আমাদের সরোজবাবুর কথা ভেবে দ্যাখ তো। এত ভালো পড়ান, আমার তো তাতেই ওঁকে বেশি রোমান্টিক লাগে।

অন্যদিক : রোমান্টিক?

ছবি : নয়? যখন কবিতা আবৃত্তি করেন, দারুণ। তা সে রবীন্দ্রনাথই হোক, আর জীবনানন্দই হোক—আমার তো ভীষণ ভালো লাগে।

অন্যদিক : ওসব তোদের অনার্স কোর্সের ব্যাপারই আলাদা।

ছবি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে সময়েই শোনা গিয়েছিল, ঠাকুরঝি!

ছবি আর জবাব দিতে পারেনি। ছাদের ধারে সরে এসে, নিচের উঠোনের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেখানে তার বৌদি দাঁড়িয়ে ছিল।

বলেছিল, মা বলছেন, আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

ছবি জবাব দিয়েছিল, যাচ্ছি। তারপরে হড়দের বাড়ির দিকে তাকিয়ে, হাত তুলে, পিছনে ফিরে খোলা চুলের গোছায় দু'হাতে কয়েকটা ঝাপটা দিয়ে, সিঁড়ির দরজা দিয়ে নেমে গিয়েছিল। শীতেশ তারপরেও আশা করেছিল, নাম-না জানা ছবিটি হয়তো উঠোনে এসে দাঁড়াবে। আসেনি। শীতেশের চোখের সামনে তখন একটি ছবি, আর কিছু কথা। কিন্তু হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়েছিল, ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে না, হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরেই ডেকে উঠেছিল, রাধিকা রাধিকা, উহ্, তুই ডোবাবি। শীগগির খেতে দে। আমার গাড়ি বোধ হয় চলে গেল।

রাধিকা বলেছিল, আমি তো সেই কখন থেকে টেবিলে খাবার দিয়ে রেখেছি।

শীতেশ বলেছিল, বলবি তো।

রাধিকা চোখ নামিয়ে নিয়ে বলেছিল, কতবার আপনাকে ডেকে গেলাম, আপনি তো শুনতেই পাচ্ছিলেন না।

শীতেশ কথা বলতে গিয়ে, মনে হয়েছিল গলায় কাঁটা বিঁধে গিয়েছে। হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারেনি। তারপরেই ঝেঁজে উঠে বলেছিল, বাজে কথা বলিস না রাধিকা, বুঝলি?

রাধিকা ঠিকই বুঝেছিল, তা-ই কোনো জবাব দেয়নি। বুঝেছিল শীতেশও, যে ওর অবলোকনের চৌর্যবৃত্তির সাক্ষী একমাত্র রাধিকাই। কিন্তু সে কথা স্বীকার করা সম্ভব ছিলো না। নির্বিবাদে ওকে ঠাণ্ডা খাবারই গলাধঃকরণ করে ছুটতে হয়েছিল। ভরসা এই, রাধিকা ওর আঁতের লোক হয়ে উঠেছিল। কথাটা কানাকানি জানাজানি হবার সম্ভাবনা ছিলো না।

সেই থেকেই শুরু, সেই সকালের প্রথম রোদে. চুল শুকোতে দেখার দিন থেকে। যে শীতেশ কন্যাদের এবং কন্যাদের পিতৃকুলের দ্বারা বিপদগ্রস্ত, বিড়ম্বিত, নিপীড়িত বলা যায় এবং দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না, সে তখন একজনকে দেখবার জন্য

পশ্চিমের ধারের জানালায় চুম্বকের মতো আটকে যাচ্ছিল। কেবল তা-ই না, সময় বেছে নিয়ে, মিল থেকে ফেরবার রাস্তাঘাটও একটু অদল বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যদি একবারটি দেখা যায়।

সেই চোরা কৌশল যে একবারও কাজে লাগেনি, তা না। ঠিক লেগে গিয়েছিল, যদিও খুবই কম। সেই কমটাই ওর কাছে অনেকখানি। অবিশ্যি চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেত না, তথাপি না তাকিয়ে পারেনি। অন্যদিক থেকে একবারও ওর দিকে চোখ পড়েছে বলে মনে হয়নি। যে কারণে মনে হয়েছে, চণ্ডী চাটুজ্যের মেয়ে, নীপা চ্যাটার্জি মেয়েটি বেশ অহংকারি। শীতেশ নীপার নামটা জানতে পেরেছিল, নীপাকে বাড়ির লোকদের নাম ধরে ডাকাডাকি শুনে। আরো একটা নামও জানা হয়ে গিয়েছে, সেটা নীপার ডাকনাম, রাধা। ওর বাবা আবার মোটা স্বরে বেশ আদুরে গলায় ডাকেন, রাধে! নীপা যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ে, সেটা ওর আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। পরে জেনেছিল, এটাই ওর অনার্সের শেষ বছর।

নীপার নিজস্ব ঘরটাও ওর চেনা হয়ে গিয়েছিল। নীপা যে টেবিলের সামনে পড়তে বসে সে জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হয় সেই ঘরেরই অন্য পাশে নীপার শোবার খাট রয়েছে। নীপা প্রায়ই ছাদে ওঠে, বিশেষ করে বিকালের দিকে। শীতেশ মিল থেকে ফিরে যেদিন দেখতে পায় লীনা এসে অপেক্ষা করছে না, সেদিন ও আর পশ্চিমের জানালা ছেড়ে নড়ে না। অবিশ্যিই খুব সাবধানে পর্দার ফাঁক থেকেই দেখে। যাতে নীপা কোনোরকম টের না পায়। নীপা ছাদে উঠলেই হড়দের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। সেই সব কথাবার্তা থেকেই, শুধু নীপার খবর না, আরও অনেক খবর জানা যায়।

কখনো কখনো নীপা হঠাৎ শীতেশের জানালার দিকে তাকিয়েছে। শীতেশ একেবারে বিদ্যুতাহতের মতো ছিটকে সরে এসেছে। তারপরেই হড়দের বাড়ির দিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এসেছে, কী রে

নীপা, ওদিকে কেউ আছে নাকি ?

নীপার জিজ্ঞাসা, কোথায় ?

অন্যদিক : যেদিকে তাকালি ?

নীপা : কই না তো। ওসব তো তোদের ব্যাপার !

অন্যদিক : আমাদের না, মেজ্‌জ্যাটার ব্যাপার। জানিস তো সব।

মেজ্‌জ্যাটা অর্থাৎ শীতেশের বাড়িওয়ালা, যিনি তাঁর কন্যার জন্য শীতেশের প্রতি দৃষ্টিদান করেছেন। কিন্তু মেজ্‌জ্যাটার ভাইঝিদেরও শীতেশ জানে, যে কারণে ও পূব দক্ষিণে গিয়ে দাঁড়াতেই পারে না। রাধিকার কাছে তাদের নানা জিজ্ঞাসার আর শেষ নেই। হুড়দের শরিকি বিশাল বাড়িতে, ঘরে ঘরে চায়ের ডাক তো পড়েই। মাঝে মাঝে রাধিকার হাত দিয়ে ব্যঞ্জনাদিও আসে।

শীতেশ নীপার কথাই কান পেতে শোনে। নীপা বলে, আমার আবার জানাজানির কী আছে। আমি ওসব কথায় কান দিই না। তবে তুই আর ভালোমানুষি করিস না।

অন্যদিক : মাইরি নীপা, আমার কিছু নেই।

নীপা বিরক্তির সঙ্গে বলে, যাকগে, ওসব আমার জানবার দরকার নেই

এ ধরনের কথাবার্তা কদাচিৎ শোনা গিয়েছে। তবে শীতেশ লক্ষ্য করে দেখেছে, নীপা হঠাৎ-হঠাৎ ওর জানালার দিকে তাকায়। তখন ওর ভ্রূকুটি সুন্দর চোখে কেমন একটা সন্দেহের ঝিলিক দেখা যায়। শীতেশের বুক গুরগুরিয়ে যায়, ভাবে মেয়েটা কি তবে দেখতে পেয়েছে ? শীতেশ তৎক্ষণাৎ পর্দার আড়ালে।

একমাত্র চণ্ডীচরণ চাটুজ্যেকেই শীতেশ নিজের থেকে যেচে একদিন রাস্তায় হঠাৎ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, নমস্কার।

চণ্ডী চাটুজ্যে তাঁর মোটা লেন্সের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তেমন একটা অবাক না হয়েই এবং কপালে হাত না ঠেকিয়ে বলেছিলেন, নমস্কার। তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

প্রথম সম্বোধনেই তুমি। রাশভারি ব্যক্তিটির সামনে শীতেশ

প্রায় ঘেমে উঠেছিল। বলেছিল, আমাকে আপনি চেনেন না, আপনাকে আমি চিনি। আমি হড়দের বাড়িতে ভাড়া থাকি।

চণ্ডী চাটুজ্যে নির্বিকার বলেছিলেন, অ! বাইরের লোক। কী করা হয়?

এখানকার মিলে কাজ করি।

চটকলে? এমনভাবে বলেছিলেন, শীতেশের মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী কাজ?

ওভারসিয়র।

ওই বাড়ি ঘর-দোর বানায় যারা?

শীতেশ বলেছিল, ঠিক তা না, এটা জুট টেকনিকাল কাজ।

চণ্ডী চাটুজ্যে বলেছিলেন, তা হবে। শুনেছি, আজকাল চটকলের নাকি একটু উন্নতি হয়েছে। আগে তো ওখানে অশিক্ষিত লোকেরাই কাজ-কর্ম করত। তোমার লেখাপড়র কদ্দুর?

শীতেশের অবস্থা তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। বলেছিল, বি. এস-সি পাস করে জুট টেকনোলজি পাস করেছি।

চণ্ডী চাটুজ্যে বলেছিলেন, তা ভালোই। এখানে কি সপরিবারে থাকা হয়?

আজ্ঞে না একলাই থাকি।

বিবাহ হয়নি?

না।

হুঁ, বেশ ভালো, আলাপ হলো। বলে শীতেশকে একবার আপাদমস্তক দেখে, হাতের লাঠিটি ঠুকে চলে গিয়েছিলেন। শীতেশ আর কখনও ভদ্রলোকের ছায়া মাড়ায়নি। কথা বলেন না, যেন বিছুটির ছপটি মারেন।

তারপরেই ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনা। পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখার অন্তত: দু'মাস পরের ঘটনা। সে দিনটা শীতেশ নীপার দর্শনের

আশায় রাস্তা চলছিল না, কারণ ওর ধারণা ছিল, নীপা তখন বাড়ি ফিরে গিয়েছে। রাস্তাটাও নিরালাই ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেয়েছিল, এই যে—শুনছেন?

শীতেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নীপা! কিন্তু তার চোখ মুখ রীতিমত গম্ভীর আর কঠিন। শীতেশ কোনোরকমে বলেছিল, আ-আমাকে বলছেন?

নীপার স্পষ্ট তীক্ষ্ণ স্বর, হ্যাঁ আপনাকে। আপনি জানালা দিয়ে সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে দেখেন কেন বলুন তো?

শীতেশের বুক ধক করে উঠেছিল, প্রায় আঁতকে উঠে বলেছিল, আমি?

নীপা তেমনি ভাবেই বলেছিল, হ্যাঁ আপনি, আপনার চাকর না, তা হলে অনেকদিন আগেই চাঁটি কষিয়ে দিতাম।

শীতেশ তোতলার মতো বলেছিল, কিন্তু দেখুন—।

থামুন! নীপা ধমকে উঠেছিল, আমি না দেখে কিছু বলছি না। ফের যদি ওরকম করেন, তা হলে আমি লীনাদিকে সব বলে দেবো।

শীতেশ থতমত খেয়ে বলেছিল, লীনাদি কে?

নীপা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, চেনেন না যেন, না? আপনাদের মিলের ম্যানেজার চৌধুরির মেয়ে, যে আপনার বাড়িতে রোজ আসে। আর শুনবেন?

অ্যাঁ? অ্যাঁ-কী?

যে লীনা চৌধুরির সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। তাকেই আমি সব বলে দেবো।

শীতেশ আর সব ভুলে, প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, না না, না, মিথ্যে কথা। আপনি ভুল করছেন। কারুর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে না।

নীপা হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারেনি। ওর কঠিন মুখে হঠাৎ যেন একটু রঙ ফেরবার উদ্যোগ করছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার

শক্ত হয়ে বলেছিল, আমি যা শুনেছি, তা-ই বললাম। মোটের ওপর আমি কিন্তু বলে দেবো।

শীতেশ উদ্বিগ্ন অসহায় করুণভাবে বলেছিল, কিন্তু দেখুন—

নীপা বাধা দিয়ে বলে উঠেছিল, কিন্তু শুনতে চাই না। আপনি আর ওরকম লুকিয়ে দেখবেন না, বলে দিলাম।

বলেই হনহন করে চলে গিয়েছিল। শীতেশের মনে হয়েছিল, রাস্তাটা যেন ধসে পড়ছে। চোখের সামনে সব অন্ধকার। বোধহয় দু'মিনিট ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। বাড়ি ফিরে আগেই পশ্চিমের জানালা বন্ধ করেছিল। রাধিকাকে বলে দিয়েছিল, কখনও, কোনো কারণেই যেন আর পশ্চিমের জানালা খোলা না হয়।

বলতে গেলে, শীতেশ একরকম ভেঙেই পড়েছিল। এত লজ্জা করেছিল যে, যেন ও আর এ বাড়িটায় বাস করতেই পারবে না। নীপাকে ও মন থেকে সরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছিল।

এই ঘটনার সঙ্গেই, অন্যদিকের পরিস্থিতি আরও ঘোরালো এবং জটিল হয়ে উঠেছিল। লেবার অফিসার ঘোষাল একদিন হাসতে হাসতে, ভুঁড়ি নাচিয়ে, বগবগিয়ে বলে গিয়েছেন, আমি শুনেছি—মানে আমাকে ইচ্ছে করেই শোনানো হয়েছে, তুমি একটু নেশা-টেশা করো। অন্যান্য দোষও নাকি একটু-আধটু আছে। চোখে অবিশ্যি দেখিনি, তা ব্যাটাছেলেদের ওরকম একটু-আধটু থাকেই। সোনার আংটি আবার বাঁকা। কিছু ভেবো না, আমি ও সব কানে নিইনি, আমার স্ত্রী না মেয়েও না।

শীতেশ কী বলবে ভেবে পায়নি। দিশেহারার মতো ঘোষালের দিকে তাকিয়েছিল।

ঘোষাল ওর পিঠ চাপড়ে হাসতে হাসতে, বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যার অর্থ, তালুকদার তার অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছিল।

এ ঘটনার দু'দিন পরেই, চৌধুরি বেলা চারটে নাগাদ হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক এমনিতেই তো রামগরুড়ের ছানা। সেদিন সেই কালো গম্ভীর মুখের দিকে যেন তাকানো যাচ্ছিলো না। বলেছিলেন, এসো, এসো, বোসো। তা এরকম একটা সুখবর আমাদের এতদিন বলনি কেন?

শীতেশ অবাক হয়ে বলেছিল, কিসের সুখবর বলুন তো?

চৌধুরি তাঁর কালো মুখ নিকষ করে বলেছিলেন, তোমাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সুপারভাইজর ব্যানার্জির মেয়েকে নাকি তুমি বিয়ে করছ?

শীতেশ প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল, অন গড স্যার, আমি এ সবের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

চৌধুরি বলেছিলেন, স্ট্রেঞ্জ। ব্যানার্জি আমাকে বললো, তার মেয়েটিকে নাকি তোমার খুবই পছন্দ, বলতে গেলে একরকম কথাই দিয়ে দিয়েছ।

শীতেশ বলেছিল, বিশ্বাস করুন স্যার, একদম বাজে কথা। সে তো একটা তের চোদ্দ বছরের মেয়ে, আমি কল্পনাই করতে পারি না স্যার।

চৌধুরি নীরব, ধীরে ধীরে তাঁর মুখে হাসিহীন প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, আমিও তা-ই ভাবছিলাম, শীতেশের মতো ছেলের পক্ষে, হাউ ইট ইজ্ পসিবল্। অবিশ্যি ব্যানার্জি লোকটা একটু কথা বানিয়ে বলে। তা বলে, এ-রকম বলাটা তো তার উচিত না। সে এটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

শীতেশ শপথবাক্য উচ্চারণের মতো বলেছিল, অল্ লাই স্যার।

এনি হাউ, তুমি আর এসব নিয়ে কোনো কথা বলতে যেও না। লেট দ্য ডগ বার্ক। কিন্তু তুমি আমাকে স্যার স্যার কোরো না, শুনতে ভালো লাগে না।

শীতেশের শিরদাঁড়াটা কেঁপে উঠেছিল। তবু হাসবার চেষ্টা করেছিল। বিদায় নিয়ে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বাঁড়ুয্যের নাকে একটা ঘুষি মারতে ইচ্ছা করেছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা লীনা, বেশ কয়েকদিন পর, শীতেশের বাড়িতে এসেছিল। ইতিমধ্যে সে শীতেশকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছিল। এসেই বলেছিল, ওহ, আজ বাবার মুখে সব শুনে তবে তোমার কাছে আসতে পারলাম। মনটা এমন ভেঙে পড়েছিল। শেষে কী না, ইল্লিটারেট আনকালচার্ড একটা বাচ্চা মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ?

শীতেশের হাসি আর ছিলো না। করুণভাবে বলেছিল, সবই তো শুনেছেন মিঃ চৌধুরির কাছ থেকে।

অমনি লীনা তার মোটা মোটা ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, আবার আপনি? তা হলে আমি আর তুমি করে বলব না কিন্তু।

শীতেশ হেসে বলেছিল, মানে চেষ্টা করে যাচ্ছি, এখনো ঠিক আসছে না।

তারপরেই লীনা উদ্বিগ্ন স্বরে বলেছিল, কিন্তু কয়েকটা কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

শীতেশ জিজ্ঞেস করেছিল, কী?

লীনা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, জানতে পেরেছি তুমি দুশ্চরিত্র লম্পট মাতাল। উহ্, তোমাকে দেখে একটুও বুঝতে পারিনি। উহ্ হু হু…।

শীতেশ অসহায় ব্যস্ততায় বলেছিল, শুনুন শুনুন মিস্ চৌধুরি, ব্যাপারটা মানে—লীনা দু'হাত দিয়ে, শীতেশের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, না না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি আমাকে ছুঁয়ে প্রমিস করো, ওসব তুমি ত্যাগ করবে? বলো বলো, করবে?

শীতেশ স্থির বুঝেছিল, লীনাকে বিশ্বাস করানো যাবে না। বলেছিল, করব, প্রমিস করছি, করব।

আহ্, হাউ গুড বয় য়ু মাই শীতেশ! বলে লীনা হেসেছিল।

তারপরের নতুন ঘটনাটি ঘটে, নীপার অপমানের দিন দশেক পরে। এবারেও সেই নীপা। ইতিমধ্যে প্রায়ই একটা ঘটনা ঘটছিল।

পশ্চিমের বন্ধ জানালায় ভরত্বপুরে শীতেশ যখন লাঞ্চের বিশ্রামে থাকে, তখন, অথবা সন্ধ্যের মুখে, ঢিল পড়ছিল। ঘন ঘন না, হঠাৎ একটা কিংবা ত্নটো। একদিনই সন্ধ্যের মুখে ঢিল পড়তে জানালাটা খুলে দেখেছিল। কারোকে দেখতে পায়নি। নীপাদের ছাদে বসে ছিল, নীপা আর ওর বৌদি। কিছু ভাববার আগেই ও জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ, প্রথমতঃ ওদিক থেকে ঢিল মারার কথা কল্পনাই করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ একটা হিতে বিপরীত হতে পারত।

দিন দশেক পরে শীতেশ দ্বপুরে মিলে ফিরছিল। দশ দিন আগের মতো, সেই একই গলাও শুনতে পেয়েছিল, এই যে, শুনছেন? শুনুন।

শীতেশ ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন ওর বুকে বল ছিলো। কারণ ওর কোনো অপরাধ ছিলো না। একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করেছিল, বলুন।

নীপার মুখ কঠিন ছিলো না, একটু যেন বিরক্তি মাখানো। জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি ওরকম জানালা বন্ধ করেন কেন?

শীতেশ অবাক হয়ে বলেছিল, মানে?

নীপা বলেছিল, মানে, চব্বিশ ঘণ্টা জানালা বন্ধ রাখেন কেন?

শীতেশ বলেছিল, তা হলে যে আপনাদের বাড়ির দিকে চোখ পড়ে যাবে।

যাক না, ক্ষতি কী।

আপনাকে দেখে ফেলব।

নীপা গম্ভীরভাবেই বলেছিল, দেখবেন। লোকে লোককে দেখবে না। কিন্তু লুকিয়ে কেন। সোজাসুজি তাকিয়ে দেখতে পারেন না?

শীতেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে শব্দ করেছিল, অ্যাঁ? সোজাসুজি?

নীপা বলেছিল, হ্যাঁ, সোজাসুজি। মানুষ মানুষকে দেখবে, এ আর আশ্চর্য কী। আপনি তো আর কানা নন।

শীতেশ বলে উঠেছিল, না না। তারপরেই একটু সন্দিগ্ধ স্বরে বলেছিল, আমার পশ্চিমের জানালায় কে ঢিল মারে জানেন?

নীপার মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছিল। তারপরই আক্রমণের

ভঙ্গিতে বলেছিল, তার মানে কি বলতে চান, আমি ঢিল মেরেছি ?

শীতেশ বলেছিল, তা তো আমি দেখিনি।

তবে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

শীতেশও একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিল, জিজ্ঞেস করলে কী হয়। শুধু জিজ্ঞেস করেছি তো।

না, ও রকম জিজ্ঞেস করবেন না। বলে ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে, আবার বলেছিল, ও-রকম অষ্টপ্রহর জানালা বন্ধ থাকলে ঢিল পড়বেই। বলেই হন হন করে চলে গিয়েছিল।

শীতেশ হতবাক হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপরে নিজের মনেই বলেছিল, উড়ন তুবড়ি নাকি রে বাবা ?

মিলের ছুটির পরে, ফিরে এসেই পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিয়েছিল শীতেশ। রাধিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, আপনি ভুলে গেছেন, ওটা তো খোলা বারণ।

খোলা বারণ ? কে বলেছে ?

আপনিই তো বলেছিলেন।

ওহ্, হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। এখন থেকে এ জানালা খুলে রাখবে। বলেই ও পর্দা সরিয়ে তাকিয়েছিল।

নীপা ছাদের এক ধারে বসেছিল, যেখানে নারকেল গাছের ছায়া পড়েছিল ওর গায়ে। নীপার কোলের ওপরে বই এবং ওর দৃষ্টিও বইয়ের দিকে ছিল। জানালা খোলার শব্দে বা যে কোনো কারণেই হোক, জানালার দিকে তাকিয়েছিল। শীতেশ তাড়াতাড়ি সরে আসবে ভেবেছিল, পারেনি, কারণ মনে পড়ে গিয়েছিল, সোজাসুজি তাকাবার কথা। ও সোজাসুজিই তাকিয়েছিল, যদিও কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। নীপা চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। আবার তাকিয়েছিল, শীতেশের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল। কয়েকবারই নীপা মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু যতবার তাকিয়েছিল, শীতেশের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়েছিল। শীতেশের মনে হয়েছিল, নীপার মুখটা যেন লাল হয়ে উঠছে, ভুরুও কুঁচকে যাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ নীপা একদৃষ্টে কয়েক

সেকেণ্ড তাকিয়ে, বই হাতে নিয়ে নিচে নেমে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ ওর চোখে পড়েছিল, নিচের উঠোনে নীপার বৌদি দাঁড়িয়ে শীতেশকে দেখছে। শীতেশ তৎক্ষণাৎ সরে এসেছিল। মনে মনে হেসে ভেবেছিল যাক, আজ ঠিক সোজাসুজি তাকাতে পেরেছি।

শীতেশের এই তুষ্ট ভাবনা শেষ হবার আগেই, কলিং বেল বেজে উঠেছিল। শীতেশের মুখটা তৎক্ষণাৎ কালো হয়ে উঠেছিল। ও জানলো, লীনা এসেছে। ও তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। রাধিকা জিজ্ঞেস করেছিল, লীনা দিদিমণি বা ঘোষাল সাহেব বা ব্যানার্জি সাহেব বা হড়বাবু এলে কী বলবো ?

শীতেশ বিরক্ত হয়ে বলেছিল, কী আবার বলবি। ও ঘরে বসাবি, বলবি, উনি এখন জামাকাপড় ছাড়ছেন, চান করে আসছেন।

রাধিকা দৌড়ে চলে গিয়েছিল, কেননা, আবার বেল বেজে উঠেছিল। শীতেশ সবে মাত্র জামাটা খুলেছিল, তখনই ওর কানে ঢুকেছিল।—জামাকাপড় ছাড়ুন, ওসব জানি না। আমি একটা কথা বলে চলে যাবো। কই, কোথায় উনি ?

বলতে বলতেই নীপা এসে শীতেশের শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখ মুখ রীতিমত আরক্ত, উত্তেজিত। দরজার বাইরে থেকেই ও ঝেজে বলেছিল, কী ভেবেছেন আপনি, অ্যাঁ ?

শীতেশ তাড়াতাড়ি ওর খুলে ফেলা শার্টটা বুকের ওপর চাপা দিয়ে, হকচকিয়ে বলেছিল, কেন ?

নীপা তেমনি ভাবেই বলেছিল, কেন ? আপনি ওরকম ভাবে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলেন কেন ?

শীতেশ প্রায় তোতলা হয়ে উঠেছিল, না না, আ-আপনি যে সোজাসুজি দেখতে ব-বলেছিলেন ?

নীপা উত্তেজনায় ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, কিন্তু সোজাসুজি মানে হাঁ করে নয়, বুঝেছেন ? আপনি হাঁ করে দেখছিলেন।

শীতেশ অস্ফুটে কঁকিয়ে ওঠার মতো শব্দ করেছিল, অ।

নীপা আবার বলেছিল, জানালা খুলে কি কেবল আমাকেই দেখা

গেছলো ?

শীতেশ অবাক ভাবে বলেছিল, হ্যাঁ।

নীপা ধমকে বলেছিল, না। গাছ ছিলো, আকাশ ছিলো, আশেপাশে আরো অনেক কিছু ছিলো, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। দেখতে হলে, সবই দেখতে হবে। হাঁ করে একদিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। বুঝেছেন ?

শীতেশ কথা বলতে পারেনি, ঘাড় কাত করে সায় দিয়েছিল। নীপা তবু বলেছিল, ছাই বুঝেছেন। মাথায় গোবর পোরা আছে।

বলেই হনহন করে চলে গিয়েছিল। শীতেশ প্রায় কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো। ওর মস্তিষ্কটা যেন চিন্তাশূন্য হয়ে গিয়েছিল। রাধিকা এসে দাঁড়িয়েছিল। শীতেশ জিজ্ঞেস করেছিল, চলে গেছে ?

রাধিকা বলেছিল, হ্যাঁ। ব্যানার্জিবাবু আর লীনা দিদিমণি এসেছেন।

বলতে বলতেই লীনা ঢুকেছিল। বলেছিল, ওহ্ সরি, তোমার এখনো জামাটামা ছাড়া হয়নি। তা হলে আমি বাইরের ঘরেই বসছি। আমি তোমার জন্য একটু খাবার নিয়ে এসেছি, রাধিকাকে দিয়েছি।

শীতেশ বলেছিল, না না, আপনি না হয় এ ঘরেই—

লীনা তার চাকাপানা মুখে সলজ্জ হেসে বলেছিল, যাহ্, আমার সামনে তুমি জামাকাপড় খুলবে নাকি ?

শীতেশ চমকে উঠে বলেছিল, অ্যাঁ ?

লীনা বলেছিল, তবে ব্যানার্জি ও-ঘরে আছে, আমি সেখানে বসবো না। আমি তোমার দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়াচ্ছি।

শীতেশ উচ্চারণ করেছিল, ওহ্ ভগবান, বাঁচাও।...

তারপরে যখন তৈরি হয়ে পাশের ঘরে গিয়েছিল, ব্যানার্জি বলেছিলেন, এখন আর বসবো না, চলে যাচ্ছি। জানি তোমার মনের অবস্থা, আমি যখন বিয়ে করি, লজ্জায় শ্বশুরবাড়ি যেতে পারতাম না। কিন্তু মনটা পড়ে থাকতো সেখানেই। তবে তোমার লজ্জার কিছু নেই, তুমি যখন খুশি এসো। আমার পরিবারের মুখে শুনেছি,

আমাকে না দেখলে ওর মনটাও ছটফট করতো। এ আর কী কথা, স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পর্যন্ত তাঁর পরিবারের জন্যে—

শীতেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, কিন্তু আচার্য পি. সি. রায় তো বিয়ে করেননি কখনো?

বাঁড়ুয্যেও সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলেছিলেন, ছি ছি, কার বলতে কার কথা বলেছি উনিও আমাকে অবিশ্যি স্নেহ করতেন—যা-ই হোক, চলি, তুমি এসো কিন্তু। বলে চলে গিয়েছিলেন।

তারপরে বাঁড়ুয্যে চলে যাওয়ার পর শীতেশকে লীনা শুধু খাওয়ায় নি, শীতেশের জন্য যে তার মনের অবস্থা কী হয়ে উঠেছে, রাত্রের নিদ্রা, আহার সব ঘুচে গিয়েছে, সমস্ত কথা বলে বিদায় নিয়েছিল। আর শীতেশের চোখের সামনে ভাসছিল শুধু নীপার মুখ। ওর ঝাঁজালো কথাগুলো। স্বভাবতঃই শীতেশ জানালার দিকে আর তৎক্ষণাৎ এগোতে পারেনি। রাগও হচ্ছিলো, অথচ নীপাকে দেখবার জন্যও মনটা ব্যাকুল হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করেছিল, ঘরে বসে থাকার চেয়ে, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়া ভালো।

আজ নিয়ে তিন দিন, শীতেশ গঙ্গার ধারে আসছে। এখন অবিশ্যি বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ধার ফাঁকাই থাকে। বিশেষ করে, মালীপাড়ার মাঠের দিকটা তো বেশ ফাঁকা। ও গঙ্গার ধারে বেড়ায় বটে, কিন্তু মন পড়ে থাকে নীপার কাছেই। নীপাকে দেখবার জন্যে ওর মনটা ছটফট করে। তা-ই এক একবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। নীপাকে দেখা যায়, ছাদে, উঠোনে অথবা ঘরের জানালায়। শীতেশ আগে আকাশ, তারপর গাছ, তারপর কাক চিল শালিক, যা হোক কিছু দেখে নিয়ে, নীপাকে একবার দেখেই গঙ্গার ধারে চলে যায়। কেননা, বেশি দেখলে আবার কী বলবে না বলবে, ঠিক নেই। ও যা মেয়ে, কখন কী অপমান করে বসবে, বলা যায় না।

কিন্তু শীতেশের মনে কী রকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, রাধিকার সঙ্গে নীপার আলাপ আছে, কথাবার্তাও হয়। একদিন ও

পুবের ব্যালকনি থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল, মনে হয়েছিল, রাধিকা নীপাকে যেন কী বলছে। নীপাও ওকে কিছু বলছিল। এ ঘটনা জানালা বন্ধ থাকার সময় ঘটেছিল। শীতেশ রাধিকাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়েটা ওকে কী বলছিল। রাধিকা ভালো মানুষের মতো বলেছিল, মেয়েটা নাকি ওকে একটা চিঠি ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসতে বলেছিল। ও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সে ওসব পারবে না।

শুধু এই না। শীতেশ গতকাল যখন গঙ্গার ধার থেকে ফিরে আসছিল, রাস্তার আলোয় স্পষ্টই দেখেছিল, বাড়ির সামনে রাধিকার সঙ্গে নীপা কথা বলছে। শীতেশ আসছে দেখেই, নীপা চলে গিয়েছিল। শীতেশ জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাপার কী? রাধিকা মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, আমাকে বাজার থেকে পেঁয়াজ এনে দিতে বলছিল, আমি বললাম, পারবো না।

শীতেশ ভেবেছিল, রাধিকাকে বলে দেয়, নীপা যা বলবে, তা যেন ও করে। কিন্তু বলেনি। নীপা যদি রাধিকাকে দিয়ে কিছু করাতে চায়, তা হলে তার উচিত শীতেশের অনুমতি নেওয়া। ও বলছিল রাধিকাকে, আমাকে না বলে, কারোর কোনো কাজ করবি না।

রাধিকা মাথা নেড়ে বলেছিল, কখনো না।

আজ তিন দিন হলো, শীতেশ গঙ্গার ধারে আসছে। বেলা চারটে নাগাদ বেশ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এখন ছ'টা বাজে, আকাশে মেঘ করে আছে। তবু একটু বাতাস আছে বলে ভালোই লাগছে। গঙ্গার ধার বেশ নিরিবিলি। দূরের একটা ঘাটে, ছড়ি হাতে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক কথা বলছেন। তাঁদের সঙ্গে নীপার বাবাও আছেন। গঙ্গায় কিছু কিছু জেলেদের নৌকো ভাসছে। ইলিশমাছের জাল পেতে, নৌকা বেয়ে চলেছে।

শীতেশ প্রায় মালীপাড়ার মাঠের কাছে। এদিকটায় ঝোপঝাড় কিছু আছে। সন্ধ্যে হয়ে এলো। মেঘের জন্য একটু বেশি ঘনায়মান।

শীতেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা ঝোপের পাশ থেকে নীপা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে রাগ বা উত্তেজনা

আছে কী না, বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে শীতেশের মুখোমুখি এসে বললো, আপনি নিজেকে চটকলের বড়সাহেব ভাবেন, না?

শীতেশ আক্রমণের লক্ষ্য বুঝতে না পেরে বললো, তা কেন? মিঃ চৌধুরিকেই তো সবাই বড়সাহেব বলে—

নীপা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, জানি, আপনার ভাবী শ্বশুরমশাই।

মেজাজটা সত্যি গরম হয়ে গেল, লীনার সম্পর্কেও নীপা এ-রকম বলেছিল। একটু উষ্ণ গলাতেই বললো, আপনি আমাকে যা বলতে চান বলুন, কিন্তু ওসব ভাবী শ্বশুর-টশুর বলবেন না। আমি কারোকে বিয়ে করবো বলে ভাবিও নি, আমার কোনো ভাবী শ্বশুর নেই।

নীপা ঘাড় বাঁকিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললো, একথা চৌধুরি সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন?

শীতেশ বললো, কেন আমি তা বলতে যাবো?

নীপা বললো, কিন্তু একদিন তো আপনাকে চৌধুরি সাহেব বলবেনই, তখন?

তখন? শীতেশ হঠাৎ কিছু বলতে পারলো না। একটু থেমেই আবার বললো, যা বলবার আমি ঠিকই বলবো। কিন্তু মরে গেলেও ওঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না। বলেই হঠাৎ আবার থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু আপনার এ সব খবরে কি দরকার বলুন তো?

নীপা বললো, আমার আবার কী দরকার, কাঁচকলা। আপনাকে বলে দিচ্ছি, আপনি বড়সাহেবের মতো মেজাজ দেখাবেন না।

শীতেশ অবাক হয়ে বললো, আমি আবার মেজাজ দেখালাম কোথায়?

নীপা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, দেখিয়েছেন। আপনি রাধিকাকে হুকুম দিয়েছেন, ও যেন আমার কোনো কাজ না করে দেয়।

অ্যাঁ?

অ্যাঁ না, হ্যাঁ। আপনি কেন বারণ করেছেন?

শীতেশ প্রথমটা থতিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো। ওর চাকরকে কী হুকুম দেবে না দেবে, তা কি নীপার

এক্তিয়ারের ব্যাপার ? বললো, তা-তা-তা যদি বারণ করেই থাকি, কী হয়েছে ?

নীপা ঝাঁজিয়ে উঠলো, কেন করবেন ? পাড়ায় থাকতে গেলে, সকলেরই সুবিধা অসুবিধা দেখতে হয়। এটা কলকাতা না, মফঃস্বল শহর। আর কোনোদিন বারণ করবেন না, বুঝলেন ?

বলে নীপা আশেপাশে একবার দেখে নিয়ে, ফিরতে উদ্যত হলো। শীতেশের কাছে ব্যাপারটা রীতিমত অপমানকর মনে হলো। ও হঠাৎ ঝেঁজে বলে উঠলো, করবো, বারণ করবো, একশবার করবো, দেখি আপনি কী করতে পারেন।

নীপা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়ালো, শীতেশের চোখেব দিকে তাকালো। শীতেশের মস্তিষ্ক তখনও ঠাণ্ডা হয়নি, ও আবার বলে উঠলো, আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ। কোন্ অধিকারে আপনি আমাকে হুকুম করতে আসেন ? কিসের অধিকারে ? নিজেকে কী মনে করেন আপনি ? ম-মহারাণী ? আর কখনো আপনি আমাকে এ ভাবে বলতে আসবেন না।

শীতেশ হয়তো আরো কিছু বলতো, কিন্তু ও হঠাৎ থেমে গেল। ও দেখলো, সে ডাগর কালো দুটি চোখ ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সেই চোখের দৃষ্টি মাথার ওপর আকাশের মতোই মেঘমেদুর। মনে হলো এখনই ঝরঝর করে জল নামবে। নীপা প্রায় রুদ্ধ স্বরে বললো, আপনি আমাকে অপমান করছেন ?

আমি—।

শীতেশের কথা শেষ হলো না। নীপা পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে ফিরে চললো। শীতেশের রাগের আগুনে শুধু জল পড়লো না, সহসা অনুশোচনায় ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নীপার এমন সহসা পরিবর্তন ও আশা করেনি। ও ডেকে উঠলো, নীপা দেবী, শুনুন শুনুন, প্লিজ।

নীপা ফিরে তাকালো না, হন হন করে চলতে লাগলো, শীতেশ কয়েক পা এগিয়ে আবার ডাকলো, নীপা দেবী, শুনুন।

নীপা দাঁড়ালো না। দ্রুত পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। শীতেশ

ব্যাকুল বিভ্রান্ত মুখে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নীপার সেই ছায়া ঘনিয়ে আসা মেঘমেদুর চোখ আর রুদ্ধ স্বরের কথা বারে বারে মনে পড়তে লাগলো। ও দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। তারপর বাড়িতে এসেই রাধিকাকে জিজ্ঞেস করলো, তোকে যে আমি নীপাদের কাজ করতে বারণ করেছি, তা কি তুই বলে দিয়েছিস্?

রাধিকা নিরীহ মুখে বললো, না তো—

তা হলে ও তা জানলো কী করে?

তা তো আমি জানি না দাদাবাবু। তবে বোধহয় ভেবেছে, আপনি আমাকে বারণ করে দিয়েছেন।

শীতেশ পায়চারি করতে করতে বললো, তা-ই হবে। শোন্ রাধিকা, এখন থেকে এই নীপা দিদিমণি যা বলবেন, তা-ই করবি।

রাধিকা বললো, কী দরকার দাদাবাবু?

শীতেশ হঠাৎ রেগে উঠে বললো, আমি যা বলছি, তা-ই করবি। আমার হুকুম। বলেই সে হতাশভরে বলে উঠলো, আর বোধহয় কোনোদিন কিছু বলবেই না। ছি ছি ছি, আমি একটা গাধা। তারপরে শীতেশ নিজের মনেই বলে উঠলো, আমি ওকে অপমান করলাম?

লেবার অফিসার ঘোষাল এসে ঢুকলেন, হাসতে হাসতে বগ্ বগ্ করে জিজ্ঞেস করলেন, অপমান আবার কাকে করলে হে?

শীতেশ চমকে উঠে শব্দ করলো, অ্যাঁ?

ঘোষাল বললেন, না, কিছু না, দরজা খোলা দেখে সাড়াশব্দ না করেই ঢুকে পড়লাম। বসবো না। বাজারে গেছলাম, চাকরের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মিসেস ঘোষাল একটা কথা বলে দিলেন, তা-ই এলাম। তোমার কুষ্ঠিটা কি এখানে আছে?

কুষ্ঠি?

হ্যাঁ, মানে কুষ্ঠি। একটু দেখে নেওয়া ভালো, মানে বুঝলে না?

কিন্তু আমার কুষ্ঠি তো এখানে নেই?

সেটাই আন্দাজ করেছিলাম আমি। কলকাতায় আছে তো?

এবার যখন যাবে, নিয়ে এসো, কেমন ?

শীতেশ বললো, আজ্ঞে না। কুষ্ঠি তো জলপাইগুড়িতে রয়েছে।

জলপাইগুড়ি ?

হ্যাঁ, বাবা-মায়ের কাছে।

হুম্, তা হলে তোমাদের জলপাইগুড়ির ঠিকানাটা আমার চাই। কাল মিল থেকে নিয়ে নেবো। কেমন ? চলি।

ঘোষাল থপ্ থপ্ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। শীতেশ আবার পায়চারি আরম্ভ করলো, আর মাথার চুল টানাটানি করতে লাগলো। রাধিকা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো। তারপর আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো, দাদাবাবু, কি হয়েছে আপনার ?

শীতেশ করুণ অসহায় স্বরে বললো, হতে আর কিছু বাকী নেই। বলতে বলতেই ও থম্‌কে দাঁড়ালো রাধিকার মুখোমুখি। মাথায় একটা চিন্তা এসেছে, যদিচ অত্যন্ত দুঃসাহসিক। কিন্তু তা ছাড়া আর কোনো রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না। বললো, এই রাধিকা, নীপা দিদিমণির সঙ্গে তুই কথা বলিস তো ?

রাধিকা বললো, উনি বললে বলি।

কোনোদিন ওদের বাড়ি গেছিস ?

রাধিকা ঢোক গিলে বললো, না—না তো।

শীতেশ তথাপি একটু ভেবে বললো, আমি একটা চিঠি দেবো, ওই চিঠিটা নীপা দিদিমণিকে দিয়ে আসতে পারবি ?

রাধিকা এক মুহূর্ত ভেবে বললো, পারবো। এখুনি ?

এখুনি ? এখুনি দিতে গেলে তো ওদের বাড়ি যেতে হবে।

রাধিকা বললো, সে আমি ম্যানেজ করবো দাদাবাবু।

তা যদি পারিস, রাধিকা তোর কাছে, তোকে আমি—

রাধিকা বললো, ঠিক আছে, লিখে দিন। তারপরে কথা হবে।

শীতেশ টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল, চেয়ারে বসলো না। রাইটিংপ্যাড আর কলম টেনে নিয়ে, এক মুহূর্ত ভাবলো, তারপরে কোনো সম্বোধন না করে লিখলো—'অনুতাপের জ্বালায় পুড়ে মরে

যাচ্ছি। ক্ষমা চাই। এখন থেকে রাধিকাকে আপনার নিজের কাজের লোক বলে জানবেন। ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই। পেলাম কী না, শুধু এইটুকু জানবার জন্য বসে রইলাম।'

শীতেশ

কাগজটা ভাঁজ করে দিলো। বললো, দেখিস ডোবাসনি।

কিছু ভাববেন না।

রাধিকা বেরিয়ে গেল। শীতেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, পশ্চিমের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরেই, রাস্তার আলোয় দেখতে পেলো, রাধিকা নীপাদের দরজায়। দরজাটা খোলাই ছিলো। রাধিকা ঢুকে গেল। শীতেশের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। নীপাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। উঠোনেও তার রেশ পড়েছে। শীতেশ পরিষ্কার দেখলো, রাধিকা উঠোন পেরিয়ে, বারান্দা দিয়ে উঠে গেল। শীতেশ দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে রইলো। কেননা, ও কল্পনায় দেখতে পেলো, রাধিকাকে নীপাদের বাড়ির লোকেরা মার-ধোর করছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, সবাই ছুটে আসছে শীতেশের দোতলায়, কোথায় সেই বদমাইশটা, ভদ্রলোকের মেয়েকে চিঠি লেখে?

ক্রিং ক্রিং…। কলিং বেল বেজে উঠলো। প্রায় চোখ বুজেই শীতেশ এগিয়ে গেল বাইরের দিকে। কিন্তু দরজা তো খোলাই আছে? ভেজানো দরজাটা খুলতেই, সামনে দেখলো, চীফ ওভারসিয়ার তালুকদার। শীতেশকে দেখেই, চোখে ঝিলিক দিয়ে, হেসে ভিতরে ঢুকে বললো, চলুন, কথা আছে। বলে শীতেশকে একরকম ঠেলতে ঠেলতেই ঘরে নিয়ে এসে বললো, এ কি, অন্ধকার কেন? বলে নিজেই সুইচ অন্ করে দিয়ে আলো জ্বালালো।

শীতেশ বললো, ভীষণ পেট ব্যথা করছে, শুয়েছিলাম।

তালুকদার বললো, একটা নতুন অ্যাকশন শুরু করছি। শুনেছি, পাড়ার কিছু কিছু কন্যাদায়গ্রস্ত বাবারাও আপনার পেছনে লেগেছে।

শীতেশ বলে উঠলো, না, মানে—

আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সব জানি। শুনুন,

আগামীকাল পাড়ায় পোস্টারিং হবে আপনার নামে, "কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা জেনে রাখুন, শীতেশ রায় একটি মাতাল লম্পট অসচ্চরিত্র।" —ইতি, গোপন সংবাদদাতা।

শীতেশ আর্তনাদ করে উঠলো, মিঃ তালুকদার, আপনার পায়ে পড়ি, এই অ্যাকশন নেবেন না। আমাকে বাঁচান।

তালুকদার কঠিন মুখে বললো, আপনাকে বাঁচাবার জন্যই এসব করা হচ্ছে। আর হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরিকে একটা বেনামী চিঠিও দেওয়া হবে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, উনি শীগ্‌গিরই আপনার দাদার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তার আগেই চিঠিটা দিতে হবে। চলি, দেরি করলে আমার ওয়াইফ আবার ভীষণ রাগ করবে। ও বেশিক্ষণ বাইরে থাকা পছন্দ করে না। বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শীতেশ পিছনে পিছনে এগিয়ে গিয়ে বললো, শুনুন মিঃ তালুকদার, পোস্টারিং করলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এ পাড়া থেকে আমাকে সবাই তাড়িয়ে দেবে, ব্যাপারটা বুঝুন।

তালুকদার একটু ভাবলো, তারপরে বললো, আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি। কিন্তু আজ হোক, আর কাল হোক, পোস্টারিং করতেই হবে। বটে—না মোর, ওয়াইফ চটে যাবে। বলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

শীতেশ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। পরমুহূর্তেই রাধিকার কথা মনে হতেই, ছুটে আবার ঘরে গিয়ে, আলো নিভিয়ে, পশ্চিমের জানালায় গেল। রাধিকাকে দেখা যাচ্ছে না। ওকে কি আটকে রেখেছে? পুলিশে খবর দিয়েছে?

দাদাবাবু!

শীতেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে বললো, কে, রাধিকা?

হাঁ, আলো নিভিয়ে দিয়েছেন কেন? বলে আলোটা জ্বেলে দিলো।

শীতেশ বললো, ফিরে এসেছিস্? ওরা কিছু বলেনি তো?

রাধিকা বললো, আমাকে আবার কী বলবে। আমি নীপা

দিদিমণিকে গিয়ে বললাম, আমাকে কোনো কাজ করতে হবে কী না। বলতে বলতে সকলের চোখের আড়ালে, চিঠিটা দিয়ে দিলাম।

কোনো জবাব দিয়েছে?

হ্যাঁ। বলে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলো। ছোট্ট চিরকুটে লেখা, "ক্ষমা নেই। কিন্তু আছেও।" আর কিছু লেখা নেই। এর মানে কি, নেই আবার আছেও? হাতের লেখাটা চমৎকার। কিন্তু—নেই আবার আছে, সেটা কী?

রাধিকা হঠাৎ বললো, নীপাদি একটা কথা বলছিলো।

শীতেশ ঝটিতি ফিরে বললো, কী?

কাল বেলা দেড়টায় গঙ্গায় ভাঁটা লাগছে। বেলা দুটোয়, মালীপাড়ায় ঘাটে নৌকোর ব্যবস্থা করে, ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে যদি যান, তা হলে নীপাদি নাকি আপনাকে কী বলবে।

কিন্তু কাল যে আমার মিলে যেতে হবে—

একবেলা ছুটি নিতে পারবেন না?

শীতেশ কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। বললো, তা পারি। কিন্তু নৌকোর ব্যবস্থা কী করবো, আমিতো জানি না।

রাধিকা বললো, সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। দুটোর সময় মালীপাড়ার ঘাটে নৌকো থাকবে।

শীতেশ বলে উঠলো, ওহ্ রাধিকা, তুই আমার ভাই।

রাধিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, না দাদাবাবু, আমি আপনার সারভেন্ট। আপনি একটা ডিপার্টমেন্টের ওভারসিয়ার সাহেব, আমার ভাইটাকে ওখানে একটা বয়ের কাজে ঢুকিয়ে দিন দাদাবাবু।

শীতেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে শব্দ করলো, অ্যাঁ?

রাধিকা করুণমুখে বললো, আপনি ইচ্ছা করলেই পারেন দাদাবাবু। বলেই শীতেশের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

শীতেশ লাফিয়ে উঠে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন যা।

ঠিক বেলা দুটোয়, যখন মিলের বাঁশি বাজলো, শীতেশ মালীপাড়ার

ঘাটে এলো। ঘাট বলতে বাঁধানো ঘাট নেই, মাটির পাড়। একটি নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে লোকজন নেই। পেটে অসহ্য ব্যথা বলে, তালুকদারকে জানিয়ে চলে এসেছে, সে যেন ম্যানেজার আর জেনারেল অফিসে একটা নোট পাঠিয়ে দেয়।

শীতেশ নৌকোর দিকে এগিয়ে গেল। ছই-ঢাকা নৌকো। হিন্দুস্থানী মাঝি গলুয়ের কাছে বসে খৈনী টিপছে। সে একবার শীতেশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর ঠোঁটের ফাঁকে খৈনি গুঁজে দিয়ে, ছইয়ের দিকে তাকালো। তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে শীতেশের দিকে তাকিয়ে বললো, উঠকে আইয়ে।

ভাঁটার পলিতে কাদা হয়েছে। তার মধ্যে শীতেশের জুতো ঢুকে গেল। তবু কোনোরকমে নৌকোয় উঠলো। মাঝি সঙ্গে সঙ্গে নোঙর তুলে লগি দিয়ে ঠেলা মেরে নৌকো পাড় থেকে সরিয়ে নিলো।

শীতেশ বলে উঠল, রোখো রোখো, অওর এক আদমি যায়েগা।

মাঝি হালেযেতে যেতে বললো, আপ অন্দরমে যাকে বৈঠিয়ে।

শীতেশ অবাক হয়ে মাঝির দিকে তাকালো। আর একবার পাড়ের দিক। ভাবলো, নীপা বোধহয় অন্য ঘাট থেকে উঠবে। ও নিচু হয়ে জুতো খুলে ছইয়ের ভিতর গেল। গিয়েই থমকে গেল ছইয়ের ভিতর, পিছনের এক কোণে নীপা উল্টো দিকে মুখ করে বসে আছে। বাসন্তী রঙের লাল পাড় শাড়ি আর বাসন্তী রঙেরই জামা। চুল খোলা, ঘাড়ের কাছে একটা চওড়া ফিতে দিয়ে বাঁধা। নৌকো তখন ভাঁটার টানে তরতরিয়ে দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে।

শীতেশ নীপার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। অথচ কী বলা উচিত, তাও ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ নীপা ওর দিকে একবার তাকালো। মনে হলো কাজল টানা ডাগর চোখে, রোষ কষায়িত দৃষ্টি।

শীতেশের মুখে ব্যাকুল অসহায় অভিব্যক্তি। কথা বলবার আপ্রাণ চেষ্টায়, ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। তারপরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আছে কি নেই।

নীপা আবার ফিরে তাকালো, ওর গালের ওপর চুল এসে

পড়লো। বেশ ঝাঁজালো স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কী আছে কি নেই।

ক্ষ-ক্ষমা ?

নেই। বলেই নীপা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

শীতেশ চেষ্টা করে আবার বললো, আমি বুঝতে পারিনি।

নীপা ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে বললো, না বোঝার কিছু নেই, বোঝবার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে আপনার।

শীতেশ তাড়াতাড়ি বললো, তা হয়েছে। ভুল হয়ে গেছে, বিশ্বাস করুন নীপা দেবী।

আমার আবার দেবী কোন্‌খানটায় দেখছেন ?

শীতেশ থতিয়ে গিয়ে বললো, না, মানে মিস্ চ্যাটার্জি।

আমি ওসব মিস্ ফিস্ ভালোবাসি না। ওসব চটকলের সাহেবদের বাড়িতে গিয়ে শোনাবেন। নীপা আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো।

শীতেশ অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলো, তা হলে কী বলবো ?

নীপা এবার মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দিলো, জানি না।

শীতেশও চুপ করে রইলো। নৌকো একটু দুলছে। ভাঁটার টানে চললেও মাঝি বৈঠার চাড় দিয়ে গতি দ্রুত করছে। খানিকক্ষণ কোনো কথাবার্তাই নেই। হঠাৎ নীপার গলা শোনা গেল, যা-ই হোক, বিয়ের নেমন্তন্নটা যেন পাই, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শীতেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে ? কার বিয়ে ?

কার আবার, আপনার।

কে বলেছে আমার বিয়ে ?

হবে তো শীগ্‌গিরই, যার সঙ্গেই হোক।

তার মানে ?

তার মানে হয় চৌধুরি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে, না হয় ঘোষাল সাহেবের মেয়ের সঙ্গে, না হয় তো ব্যানার্জির মেয়ের সঙ্গে।

শীতেশ গম্ভীরভাবে বললো, তা যদি আপনি ভেবে থাকেন, তা হলে খুবই ভুল করেছেন। দরকার হয়, এখান থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো, তবু এদের কোনো মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো না।

নীপা এবার ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন ?

শীতেশ একটু উত্তপ্তভাবে বললো, কে-কেন আবার? আমার পছন্দ না।

নীপার চোখের তারা স্থির, ভুরু টান টান, তবে কাকে পছন্দ ?

শীতেশ নীপার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মুগ্ধ হয়ে গেল, কথা বলতে পারলো না। নীপা বললো, থাক, দরকারই বা কি শোনার।

শীতেশের মনে হলো ও নীপার কাছ থেকে অনেকটা দূরে বসে আছে। কিন্তু কাছে বসবে, সেটাও অশালীন লাগছে। বললো, মিস্ চ্যাটার্জি—

নীপা ঘাড় ফিরিয়ে বললো, মিস্ ফিস্ বলতে বারণ করলাম না ?

শীতেশ বললো, আচ্ছা, শুনুন নীপা চ্যাটার্জি—

ওটা আবার কেমন ঢঙের ডাকা ? আধুনিক ?

না, মানে, তা হলে শুধু নীপা বলতে হয়।

আমার নাম যে নীপা তা জানলেন কেমন করে ?

শীতেশ থতিয়ে গিয়ে বললো, কে যেন বলেছিল।

যেচে যেচে, আপনার কানে কানে, না? আপনি জানালা দিয়ে ওভাবে আমাকে দেখতেন কেন ?

শীতেশ বলবে না বলবে না করেও বলে ফেললো, ভালো লাগতো।

নীপার মুখ লাল হয়ে উঠলো। হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারলো না, মুখটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলো।

শীতেশ একটু থেমে বললো, না দেখে থাকতে পারতাম না।

নীপা মুখ ফেরালো না, কোনো কথা বললো না। শীতেশের মনটা তখন আবেগে থরথর করছে, আবার বললো, বললে বিশ্বাস করবেন না, কখন ছুটি হবে, কখন এসে জানালায় দাঁড়াবো, আপনাকে— ।

নীপা বললো, কী বলতে যাচ্ছিলেন একটু আগে, তা-ই বলুন।

শীতেশ বললো, তখন বলতে যাচ্ছিলাম, আপনার যখন দরকার হবে, তখনই রাধিকাকে ডেকে পাঠাবেন, ওকে দিয়ে যা করাবার করবেন।

নীপা বললো, সেটা ভেবে দেখবো। আর আজ এই নৌকোয়

করে গান্ধীঘাটে বেড়াতে যাবার কথা কলে-মিলে-পাড়ায়, সবাইকে বলে বেড়াবেন, কেমন ?

শীতেশ অবাক হয়ে বললো, সবাইকে ? কেন ?

নীপা ঠোঁট উল্টে, বিরক্তির ভঙ্গি করে বললো, ন্যাকা !

বলেই মুখটা ফিরিয়ে নিলো। শীতেশ হঠাৎ হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললো, কী বললেন বুঝতে পারলাম না ।

নীপা মুখ ফিরিয়ে বললো, বলেছি, ন্যাকা, বুঝেছেন ?

শীতেশ বললো, বুঝেছি, মানে আজকের কথা কাউকে বলবো না।

নীপা প্রায় ভেঙচি কাটার ভঙ্গিতে বললো, আজ্ঞে ?

শীতেশ বললো, না, সে তো জানি এ আমাদের গোপন ব্যাপার।

নীপা ঘাড় বাঁকিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, মাঝি বলে উঠলো, গান্ধীবাবাকা ঘাট আ গেইল্ হো দিদিমণি।

বলতে বলতেই নৌকা ঘাটে ধাক্কা খেলো। শীতেশের মাথা ছইয়ে ঠুকে গেল। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ও আগে বেরিয়ে গিয়ে জুতো পরলো। কাদায় জুতোর অবস্থা যাচ্ছেতাই। এখানে অবিশ্যি বাঁধা ঘাট। ভাঁটার জন্য সিঁড়ির জল নেমে গেছে, পিছল সিঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

শীতেশ সাবধানে নামলো। মুশকিলে পড়লো নীপা। ফরসা পায়ে, চকচকে স্লিপার। একলা নামাই মুশকিল। শীতেশও কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। নীপা ধমকে উঠলো, আমার হাতটা ধরবেন তো।

শীতেশ বলে উঠলো, ওহ্, হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিলো।

নীপা শক্ত করে ওর হাতটা ধরে, নামলো। শীতেশের পা একটু পিছলে গেল। নীপা ভয়ে শীতেশের বুকের জামা আঁকড়ে ধরে, ওর গায়ের কাছে লেপটে এলো। মাঝি বলে উঠলো হুঁশিয়ার।

দুজনেই কয়েক সেকেণ্ড, পতন সামলাবার জন্য স্থির হয়ে রইলো! তারপর হাত ধরাধরি করে, পা টিপে টিপে, ওপরে উঠে গেল। মাঝি বললো, আপলোগকা ঘুম্‌নে উম্‌নেমে কেত্‌না টাইম লাগেগা ?

নীপা শীতেশের দিকে তাকালো। শীতেশ নীপার দিকে। তারপরে নীপা মাঝির দিকে ফিরে বললো, এক দেড়ঘণ্টা।

মাঝি বললো, সমঝ লিয়া।

নীপা বললো এখন হাতটা ছাড়বেন তো, না কী?

শীতেশ চমকে নীপার হাত ছেড়ে দিলো। ওপরে উঠে, শীতেশ দেওয়ালের গায়ে পাথরে খোদাই, গান্ধী কীর্তির নানান্ দৃশ্য দেখতে লাগলো। আগে কখনো দেখেনি। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল।

এক সময়ে, হঠাৎ শীতেশ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আশেপাশে কোথাও নীপাকে দেখতে পেলো না। মন্দিরের বাইরে গেল। এখানে ওখানে ঘুরে, চারপাশে দেখলো নীপা কোথাও নেই। নদীর দিকে দেখলো নৌকো ঘাটের এক পাশে নোঙর আছে। কিন্তু নীপা কোথায়? আবার সামনের চত্বরে ফিরে এলো। তারপরেই লক্ষ্য পড়লো, উত্তর দিকে, খানিকটা দূরে গাছতলায় নীপা বসে আছে। ঘাসের ওপর আঁচল লুটানো। দৃষ্টি গঙ্গার দিকে।

শীতেশ সেদিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললো, খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

নীপা বললো, হারিয়ে গেছলাম। বাদাম খাবেন?

হ্যাঁ। বলে শীতেশ হাত বাড়ালো।

নীপা বললো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবেন নাকি?

না না। বলেই নীপার পাশে বসে পড়লো।

নীপা বললো, আরে, আমার আঁচলে বসছেন কেন? আঁচলটা টেনে বুকে ঢাকা দিলো। তারপর এক মুঠো বাদাম ওর হাতে দিলো। দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বাদাম ছাড়িয়ে চিবোতে লাগলো।

শীতেশের মুঠোয় বাদাম পড়ে রইলো, নীপার দিক থেকে সে চোখ সরাতে পারছে না। নীপার মুখ আস্তে আস্তে লাল হচ্ছে। নাসারন্ধ্র কেঁপে যাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটি ফুটি। মুখটা নামিয়ে বললো, কী হচ্ছে কী এটা?

শীতেশ জিজ্ঞেস করলো, কী?

নীপা বললো, এ-রকম হাঁদার মতো তাকিয়ে থাকা?

শীতেশ থরথর স্বরে বললো, চোখ ফেরাতে পারছি না।

নীপার মুখ আরো লাল হলো। চোখের কোণে তাকিয়ে বললো, আহা! তা হলে আমি উঠে যাচ্ছি।

শীতেশ বললো, নো, প্লিজ। বলেই নীপার হাত চেপে ধরলো।

নীপা শীতেশের হাতটার দিকে তাকালো। তারপরে আস্তে আস্তে মুখ তুলে, শীতেশের মুগ্ধ মুখের দিকে তাকালো। তারপর শীতেশেরই কাঁধের কাছে মুখ আড়াল করে অস্ফুট উচ্চারণ করলো, অসভ্য।

শীতেশের বুকের মধ্যে উচ্ছলিত তরঙ্গের মতো বাজতে লাগলো, অসভ্য! অসভ্য! অসভ্য! গঙ্গার বুকেও যেন ঢেউয়ের তরঙ্গ একই তালে বেজে চলেছে।

ফেরবার পথে, শীতেশের মুখে, নীপা তুমি, সম্বোধন দাঁড়িয়ে গেল। আর স্থির হয়ে গেল, কখন কোথায় কীভাবে দেখা হবে, রাধিকার মারফৎ খবরাখবর থাকবে। তবে মাঝে মধ্যে শীতেশের বাড়িতেও সম্ভব।

শীতেশ বাড়ি ফিরে দেখলো, প্রচণ্ড ব্যাপার। মিঃ চৌধুরি, ঘোষাল, বাঁড়ুয্যে সবাই বসে আছেন। ওকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, এই যে এসেছে!

সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, সবাই থেমে গেলেন। চৌধুরি বললেন, লেট মী টক ফার্স্ট।

বাঁড়ুয্যে বলে উঠলেন, অলওয়েজ স্যার, বিকজ য়ু আর দ্য লিডর। সুভাষদা, মানে নেতাজী একবার আমাকে ঠায় তিন দিন মৌন থাকতে বলেছিলেন।

ঘোষাল বলে উঠলেন, প্লিজ ব্যানার্জি, ভ্যানতাড়া করবেন না।

চৌধুরী, বললেন, কী ব্যাপার বলো তো? পেটের যন্ত্রণায় ছুটি নিয়ে চলে এসেছ। আমি তুটোর পরেই লোক পাঠিয়েছিলাম খবর নিতে। সে বললো, তুমি বাড়িতে নেই। বিকেলে এসেও শুনি, বাড়িতে নেই। চাকরটাও বলতে পারছে না, তুমি কোথায় গেছ।

ঘোষাল বগবগিয়ে উঠলেন, হোয়াট অ্যান্ অ্যাংজাইটি—।

বাঁড়ুয্যে বলে উঠলেন, কী ভীষণ উদ্বেগ। সেই বাপুজীকে যখন—।

ঘোষাল ধমকে উঠলেন, থামুন তো মশাই।

চৌধুরি আপাদমস্তক দেখে বললেন, এখন ভালো আছ তো ?

শীতেশ ঘাড় কাত করে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ ।

চৌধুরি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেছলে তুমি ? জুতোয় কাদা, চুলটুল উসকো খুসকো।

শীতেশ ঢোক গিলে বললো, গঙ্গার ধারে গিয়ে শুয়েছিলাম। পেটে জল দেবার জন্য জলের ধারে গিয়ে কাদা লেগে গেছে।

চৌধুরি উচ্চারণ করলেন স্ট্রেঞ্জ !

বাঁড়ুয্যে বলে উঠলেন, নাথিং স্ট্রেঞ্জ স্যার। পেটে যন্ত্রণা, একলা একলা থাকে, মন বলেও তো একটা কথা আছে। সেই জন্যই গঙ্গার ধারে গিয়ে শুয়েছিল। সেবা করার তো কেউ নেই।

চৌধুরি বললেন, য়ু কুড গো টু মাই কোয়ার্টার ?

ঘোষাল বলে উঠলেন, আমার কোয়ার্টারে চলে গেলেই পারতে।

বাঁড়ুয্যে বলে উঠলেন, আরে আমার বাড়িটাও তো ছিলো, না কী হে। সেখানে আমার মেয়েই তোমার পেটে তেল জল দিয়ে মালিশ করে দিতে পারতো, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কোথায় চলে যেতো। আমি তো দেশবন্ধুকে দিয়েছি—সি. আর. দাশকে। একবার ওঁর—

চৌধুরি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন যা-ই হোক, যা করো, খবরাখবর দিও। কোয়ার্টারে যাই, সেখানে সবাই খুব অ্যাংজাইটিতে আছে। কাল মিলে কথা হবে।

শীতেশ অপরাধী মুখে ঘাড় নাড়লো। চৌধুরি কারোকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। ঘোষাল উঠে বললেন, খবরটা আমার বাড়িতেও গেছে, সবাই খুব ভাবছে, যাই, খবরটা দিই গিয়ে। তোমাকে বলে রাখি, কোনো অসুবিধা হলে স্ট্রেইট আমার কোয়ার্টারে চলে যাবে, বুঝলে ?

শীতেশ ঘাড় কাত করলো। ঘোষাল বেরিয়ে গেলেন। বাঁড়ুয্যে বলে উঠলেন, খবর সে তো আমার বাড়িতেও চলে গেছে। তবে ছাখো, ওসব সেবা-টেবা সাহেবি কোয়ার্টারে হয় না। নিজের বাড়ি না হলে কি ওসব হয় ? যা-ই হবে, তুমি সোজা আমার বাড়ি যাবে। ওটা তো তোমারই বাড়ি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যখন একসঙ্গে জেলে ছিলাম—

এই সময়ে বাড়িওয়ালা শ্রীযুক্ত হড়মশাই ঢুকলেন। বললেন, এসেছেন? যাক, কী ভাবনায় যে ফেলেছিলেন।

বাঁড়ুয্যে বললেন, চলি বাবাজী, কাল মিলে দেখা হবে।

হড়মশাই বললেন, এখন শরীর ভালো তো?

শীতেশ বললো, হ্যাঁ।

যাই তা হলে, বাড়ির লোকেরা ভাবছে।

শীতেশ বললো, আপনার ভাড়ার টাকাটা আগামীকাল---

হড়মশাই হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে সে হবে 'খন। পালিয়ে তো যাচ্ছেন না। যদিও হাত পেতে নিতে ইচ্ছা করে না—যাক, দেখা যাক ঈশ্বর কবে মুখ তুলে চান। বাড়িটা তো মেয়ের জন্যই করেছি। বলে বেরিয়ে গেলেন।

শীতেশের চোখের সামনে কুমারী গীতা হড়ের মুখখানা একবার ভেসে উঠলো। কেন যে মেয়েটার নাম গীত্যা না, ও কিছুতেই বুঝতে পারে না। কেননা, য-ফলা আকারের মতো মেয়েটার মুখ, শীতেশের মনে হয়। ঝড় থামার পরে, তছনছ অবস্থার মধ্যে একটা মানুষ যেমন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শীতেশ সেভাবে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো।

রাধিকা বললো, দাদাবাবু, আপনি হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছাড়ুন, আমি একটু চা করে দিচ্ছি।

শীতেশ যেন চমকে উঠে রাধিকার দিকে তাকালো, বললো, অ্যাঁ? না না না, কিছু করতে পারবো না। আমি শুয়ে পড়ছি, আগে তুই আমার জন্যে চা কর। বলেই ও পাশের ঘরে গিয়ে, জুতো না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়লো। চোখ বুজলো। আশ্চর্য, ঝড় না, নীপার মুখখানিই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

তারপরে যা শুরু হলো, তা কেবল শীতেশ আর নীপা। নীপা আর শীতেশ। দুজনের মাঝখানে যোগসূত্র রক্ষক রাধিকা। শীতেশ পরে জানতে পেরেছে, রাধিকার সঙ্গে নীপার অনেক দিন থেকেই কথাবার্তা চলছে। মালা পরাবার জন্য শীতেশের গলা নিয়ে যে

টানাটানি চলেছে এবং শীতেশ প্রায় উন্মাদ হতে চলেছে, এসব খবর নীপা আগেই জানতে পেরেছিল।

এখন আর কেউ বাড়িতে শীতেশের দেখা পায় না। মিলের ছুটির পরেই সে যে কোথায় চলে যায়, কেউ তার পাত্তা পায় না। চৌধুরির সন্দেহ ও ঘোষালের বাড়ি যায়। ঘোষালের সন্দেহ বাঁড়ুয্যের। বাঁড়ুয্যের সন্দেহ হুড়কের। সবাই সবাইকে সন্দেহ করছেন।

প্রায় প্রতিদিনই, শহরের আশেপাশে, গঙ্গার ওপারে, শীতেশ আর নীপা কোনো নিভৃতে চলে যায়। দুজনের হৃদয় মনের জানাজানি পেরিয়ে, টানাটানিটা প্রাণের টানাপোড়েনে পৌঁছেছে। কেউ কারোকে না দেখে থাকতে পারে না। ছেড়ে থাকতেও কষ্ট।

নীপা বলে, অনার্সটা যাবে। পড়ায় আর একটুও মন নেই।

শীতেশ বলে, আমার চাকরিটা যাবে, কাজের দিকে আমার মোটেই নজর নেই।

তালুকদারের ধারণা, শীতেশের লক্ষণ মোটেই ভালো না। দেখে শুনে তার মনে হচ্ছে, শীতেশের মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। ও বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। ওকে বাঁচাবার জন্য নতুন কোনো ফন্দি আটতে, সে মাথার চুল ছিঁড়ছে।

চৌধুরিও উদ্বিগ্ন। দু-চারদিন ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, ওর কাজে কেন মনোযোগ নেই। প্রায় প্রত্যেকদিন বিকেলে কোথায় যায়। শীতেশ স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারে না। শেষপর্যন্ত চৌধুরি, কলকাতায় শীতেশের দাদা নীতিশকে টেলিফোনে জানালেন, তোমার ভাইয়ের একটা কিছু ঘটেছে। ছুটির পরে, একদিনও বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়, কেউ বলতে পারে না। লাঞ্চের পরে মাঝে মধ্যে ছুটি নিয়ে কোথায় চলে যায়। ব্যাপারটা আমার খুবই ফিশি মনে হচ্ছে। কেউ কেউ রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তোমার ভাই মাতাল লম্পট। সে প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যেয় কলকাতার বাড়ি যায় তো?

নীতিশ উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে বললো, হ্যাঁ, প্রত্যেক শনিবার আসে।

রবিবার সন্ধ্যেয় ফিরে আসে?

হ্যাঁ, ফিরে যায়।

তোমরা কিছু টের পেয়েছ, মানে ওর পরিবর্তনের?

না তো চৌধুরিদা।

আমার মনে হয়, তুমি দু-একদিন ছুটি নিয়ে, তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে করে, শীতেশের এখানে এসে থাকো। তা হলে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে। তবে, ওকে না জানিয়ে তোমরা হঠাৎ এসো, সেটাই ভালো হবে। তা না হলে, ও হয়তো সাবধান হয়ে যেতে পারে।

নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল পরশুই যাচ্ছি।

বুঝতেই পারছ, তোমার ভাই, আমারও অত্যন্ত প্রিয়। আমার এসব না জানালে চলে না।

দাদা, টেলিফোনেই আপনার পায়ের ধুলো নিচ্ছি। আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

দূর পাগল। দ্যাখো, আমার কথা যেন ভাইকে কিছু বোলো না।

না না দাদা, তাই কখনো বলি?

ও. কে. ছাড়লাম।

টেলিফোন কেটে দিয়ে, চৌধুরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পরের ব্যাপার ঘটলো 'ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঠ্যালা' সেই-রকম। পৌণে দুটোর সময়, শীতেশ যখন মিলে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই সময়েই নীতিশ আর সরস্বতী এসে ঢুকলো। দুজনের হাতে দুটো ব্যাগ। দুজনের মুখ থমথমে গম্ভীর, চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা এবং একটা বিরক্তিমিশ্রিত ঘৃণার ভাব।

শীতেশ অবাক হয়ে বলে উঠলো, তোমরা? এই রাধিকা, এই আমার দাদা-বৌদি। হাত থেকে ব্যাগগুলো নে।

রাধিকা ব্যাগ দুটো নিয়ে নিলো। নীতিশ গম্ভীর স্বরে বললো, এসে হয়তো তোমার অসুবিধাই করেছি। বাট আফটার অল্, য়ু আর মাই ইয়ংগার ব্রাদার, রায় বাড়ির ছেলে। তুমি মিল থেকে ঘুরে এসো, তারপরে কথা হবে।

শীতেশ প্রায় থ'। কিন্তু ওর দাঁড়াবার সময়ও নেই। অথচ দাদার কথার কোনো অর্থ বুঝলো না। একটু আমতা আমতা করে বললো, আ-আচ্ছা। বৌদি, তুমি ভেতরে যাও।

সরস্বতী একটি কথাও না বলে, ফরফর করে ভেতরে চলে গেল।

নীতিশ বলে উঠলো, বাট মাইণ্ড, পাঁচটার ছুটির পরে, সোজা বাড়ি আসবে।

শীতেশ চমকে উঠে বললো, আমার—মানে—আমার একটু—

নীতিশ ধমকে উঠে বললো, কোনো কথা শুনতে চাই না। ঠিক আছে, আমি নিজেই তোমাকে মিল থেকে নিয়ে আসবো।

শীতেশ হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ে বললো, আ—তা—তা-ই—আচ্ছা।

বলে ও বেরিয়ে গেল, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়েই ওর মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেল। একে তো দাদা বৌদির হঠাৎ আগমন এবং এইরকম আচরণ। তার ওপরে নীপার সঙ্গে, মাইল দুয়েক দূরে, সুন্দরী ঝিলের ধারে দেখা করার কথা আছে। ছুটির পরেই, সেখানে রিক্শা নিয়ে ছোটবার কথা। নীপা আগেই বেরিয়ে যাবে। এখন নীপাকেই বা খবর দেওয়া যায় কী করে? রাধিকাকে কিছু বলে আসা সম্ভব হলো না। এখন গিয়ে বলতে সাহসও হচ্ছে না। মিলে ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে, কাঠের পার্টিশনের আড়ালে বসে, কেবল সিগারেট টানতে লাগলো। তালুকদার যে ওকে কতবার দেখে গিয়েছে, খেয়ালই নেই।

এক সময়ে ও হঠাৎ দেখলো, মিলের ডাক্তার ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশে তালুকদার আর বাঁড়ুয্যে উদ্বিগ্ন উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে।

শীতেশ চমকে উঠে বললো, কী হয়েছে?

ডাক্তার বললো, কিছু না, বসুন বসুন। দেখি আপনার চোখ দুটো।

বলে নিচু হয়ে শীতেশের চোখের দিকে তাকালো। আর হাত দিয়ে পাল্‌স্‌ দেখতে লাগলো। বললো, চোখ দুটো এ বিট্ অ্যাবনরমল

দেখাচ্ছে, একটু বেশি লাল। পাল্‌স্ বেশ লো। কিন্তু পাগলদের পাল্‌স্ এত লো হবার কথা না।

শীতেশ আঁতকে উঠে বললো, পাগল!

তালুকদার ধমক দিয়ে উঠলো, চুপ করে বসুন তারপর দুঃখের স্বরে বললো, ছি ছি ছি, কতগুলো লোক মিলে, একটা ইয়ং ছেলের মাথা খারাপ করে দিলে! ডাক্তার, আপনার কি মনে হয় ওকে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত?

ডাক্তার বললো, সেটা এখনই নিশ্চয় করে বলা যায় না। স্পেশালিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার। আমরা তো পাগল ভালো করতে পারি না। এর জন্য সাইকিয়াট্রিস্টরা আছেন।

শীতেশ বললো, কিন্তু আমার সে-সব কিছুই হয়নি, আমার—

তালুকদার শীতেশের কাঁধে চাপড় দিয়ে বললো, কীপ কোয়ায়েট্‌ রায়। আপনি লাঞ্চের পরে এসে এক জায়গাতেই বসে আছেন, সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন, পাঁচটা বাজতে চলেছে। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি। আজ আপনার রিঅ্যাকশন ম্যাকসিমাম্।

এই সব কথাবার্তার মধ্যেই নীতিশ এসে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে মিলের বাঁশিও বেজে উঠলো। নীতিশ শীতেশকে বললো, চল্, বাড়ি চল্।

তালুকদার বলে উঠলো, মে আই নো, হু আর য়ু?

নীতিশ বললো, আয়াম হিজ এল্‌ডার ব্রাদার।

তালুকদার খুশি হয়ে বললো, আমি ঠিক এটাই চাইছিলাম। যান, বাড়ি নিয়ে যান, ওকে একটু ভালো করে দেখুন। আমি হচ্ছি ওর সিনিয়র। আপনি কি দু-একদিন আছেন?

আছি।

ভেরি গুড, আপনার সঙ্গে পরে আমি কথা বলবো।

ধন্যবাদ জানিয়ে নীতিশ শীতেশকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়ি ফিরেই নীতিশ শীতেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শক্ত মুখে বললো, বল্ এবার, তোর কী ব্যাপার!

শীতেশ অবাক হয়ে, বললো, কী বলবো, কী ব্যাপার?

নীতিশ রাগে গরগর করে বললো, গ্যাখ ফোঁচা, এক থাপ্পড়ে তোর সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো।

শীতেশ যেন দাঁতগুলো বাঁচাবার জন্যই তাড়াতাড়ি ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ধরলো।

নীতিশ আবার বললো, কবে থেকে মদ খাওয়া ধরেছিস্? কবে থেকে লাম্পট্য শুরু করেছিস্, অ্যাঁ?

শীতেশ বললো, মদ? লাম্পট্য?

সরস্বতী কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। বললো, কিন্তু বাড়ির মধ্যে কোথাও একটাও মদের বোতল পেলাম না।

নীতিশ বললো, সেটা কিছু না, হয়তো ফেলে দেয়।

সরস্বতী কঠিন মুখে বললো, চাকরটাও এমন ঢাঁটা, একটা কথাও মুখ থেকে বের করা গেল না।

নীতিশ জিজ্ঞেস করলো, তুই রোজ ছুটির পর কোথায় যাস্?

আ—আমি?

হ্যাঁ, তুই তুই তুই। কোন্ জাহান্নামে যাস্?

শীতেশ তোতলার মতো বললো, কোথায় যাবো, এই—মানে—

নীতিশ থাপ্পড় মারতে উদ্যত হলো। তালুকদার ঢুকে পড়ে বললো, নো নো, মারবেন না মিঃ রায়। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। স্ত্রীকে বলে এসেছি, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবো। ও আবার আমার বাইরে থাকা পছন্দ করে না। চলুন, ঘরে চলুন।

নীতিশ থেমে গিয়ে তালুকদারের দিকে তাকালো। সরস্বতী তাড়াতাড়ি একটু ঘোমটা টেনে ভিতরের ঘরে চলে গেল। তালুকদার নীতিশকে নিয়ে ঢুকলো আর একটা ঘরে। শীতেশ অসহায়ভাবে বললো, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পিছন থেকে রাধিকার গলা শোনা গেল, আমিও না।

ঠিক এ সময়েই সরস্বতী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খানিকটা হুকুমের স্বরে ডাকলো, ঠাকুরপো, এদিকে এসো।

শীতেশ সরস্বতীর সঙ্গে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সরস্বতী বললো,

এবার বুঝতে পেরেছো, কেন আমার পিশতুতো বোনের সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম ?

শীতেশ জিজ্ঞেস করলো, কেন বলো তো ?

সরস্বতী জ্বলন্ত বিদ্রূপে বললো, সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারছো ? ছি ঠাকুরপো। তুমি আমার সেই ঠাকুরপো ? উহ্, হায় ভগবান !…

সরস্বতী হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। শীতেশ উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততায় বললো, বৌদি, বৌদি, কী হয়েছে বলো আমাকে, আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।

সরস্বতী কান্নাভরা স্বরেই বললো, আমাকে বলতে হবে ? তুমি মদ খাওয়া ধরেছো, তুমি মেয়েলোকের বাড়ি যাচ্ছো…।

শীতেশ এবার অসহায় যন্ত্রণায় সরস্বতীর পা ছুঁয়ে বললো, বৌদি মাতৃজ্ঞানে তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

সরস্বতী কাঁদতে কাঁদতেই লাফ দিয়ে সরে গিয়ে বললো, আমার পায়ে হাত দিও না সুড়সুড়ি লাগে। কিন্তু, কিন্তু তুমি সত্যি বলছো ?

পিছনে নীতিশের গলা শোনা গেল, থাক গো, ওকে কিছু বোলো না। ফোঁচা, এদিকে আয়।

নীতিশের গলা কোমল। শীতেশ অবাক মুখে, নীতিশের সামনে এসে দাঁড়ালো।

নীতিশ বললো, তোকে যে এখানকার লোকেরা এরকম জ্বালাতন করে মারছে, তা তো তুই বলিসনি ?

শীতেশ বললো, বলেছি দাদা, তুমি তেমন খেয়াল করোনি।

কিন্তু তোর মাথা খারাপ হবার মতো অবস্থা করে তুলেছে, তা তো বুঝতে পারি নি। এখন কেমন বোধ করছিস ? শরীরটা ভালো তো ?

হ্যাঁ, ভালোই, একটু ডিসটার্বড ফীল করছি।

খুবই স্বাভাবিক। যা, ভালো করে চান-টান কর। মাথায় ভালো করে জল ঢালবি, বুঝলি ? আমি কলকাতায় ফিরেই হেড অফিসের জুট ডিরেকটর মিঃ ডিকাম্বারকে বলে, তোকে হাওড়ার মিলে ট্রান্সফার করবার কথা বলবো।

শীতেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, সেখানে কি বাঁচবো ?

দেখা যাক।

আমার অবিশ্যি এখানেই ভালো লাগে। জায়গাটা ভালো। বেশ গঙ্গা-টঙ্গা আছে।

আরে গঙ্গা তো হাওড়াতেও আছে।

শীতেশ মূক এবং অসহায়। নীতিশ বললো, যা মাথায় জল ঢাল গিয়ে।

শীতেশ প্রায় টলতে টলতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নীতিশ আঙুলের ইশারায় সরস্বতীকে ডেকে, অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

প্রায় পৌনে সাতটার সময় শীতেশ দাদা-বৌদির সঙ্গে চা খাবার খাচ্ছিলো। সরস্বতী হাসি হাসি, অথচ একটু উদ্বিগ্ন চোখে শীতেশকে দেখছিলো। এসময়েই ঝড়ের বেগে ঢুকলো নীপা। হাতে একটা ব্যাগ। ওর চোখে মুখে প্রায় উদ্গত কান্না, অথচ তীব্র অভিমান ও রাগ। কোনোদিকে না তাকিয়ে বলে উঠলো কী ব্যাপার তোমার ? সুন্দরী ঝিলের জঙ্গল খাঁ খাঁ করছে. আমি বলে এতক্ষণ বসে ছিলাম, তুমি— । ওর গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। চোখে জল এসে পড়লো।

শীতেশ ততক্ষণে লাফ দিয়ে উঠছে, বললো, শোনো নীপা, নীপু—

নীপা কান্নার স্বরেই বললো, একলা আমি একটা মেয়ে, কী দুর্ঘটনা না ঘটতে পারতো ? তুমি একটা খবর পর্যন্ত পাঠাও নি।

শীতেশ আবার বললো, নীপু শোনো—

নীপা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো। নীতিশ আর সরস্বতী বিস্ময়ে নির্বাক, কৌতূহলিত জিজ্ঞাসায় বিস্ফারিত নেত্র। শীতেশ একবার তাদের দিকে দেখে নিয়ে নীপার কাছে গিয়ে বললো, নীপু, এঁরা আমার দাদা আর বৌদি, যাঁদের কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। ওঁরা হঠাৎ দুপুরবেলা এসেছেন।

নীপা তাড়াতাড়ি চোখ থেকে হাত সরিয়ে বললো, বলবে তো। বলেই ভেজাচোখেই, তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে নীতিশ আর সরস্বতীকে প্রণাম করলো।

সরস্বতী কেঁপে উঠলো, সুড়সুড়ির ভয়ে। শীতেশ বললো, নীপা চট্টোপাধ্যায়! আ—আ—আমার পশ্চিম দিকের বাড়িতে থাকে।

নীতিশ আর সরস্বতী নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলো। আবার নীপার দিকে ফিরে তাকালো। নীপা চোখ মুছলো। কান্না আর অভিমানের বদলে ওর মুখে এখন লজ্জার রক্তাভা ফুটছে।

নীতিশ জিজ্ঞেস করলো, সুন্দরী ঝিলের ব্যাপারটা কী?

শীতেশ লজ্জামেশানো স্বরে বললো, দু'মাইল দূরে, গ্রামের দিকে একটা বড় ঝিল আছে। ছুটির পরে—মানে আমার সেখানে—

নীতিশ বলে উঠলো, যাবার কথা ছিলো।

শীতেশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

নীতিশ আর সরস্বতী আবার চোখাচোখি করলো। নীতিশ জিজ্ঞেস করলো, সেখানে খাঁ খাঁ জঙ্গল আছে?

শীতেশ আবার ঘাড় ঝাঁকালো।

নীতিশ বললো, আর এতক্ষণ এ সেখানে একলা অপেক্ষা করছিলো?

শীতেশ কিছু বললো না। নীপার মুখ আরো লাল হলো। নীতিশ ধমক দিয়ে উঠলো, রাসকেল, ইরেসপনসিবল, কান মল্‌! কান মল্‌।

কি---কিন্তু আমার কী দোষ? তোমরা এসে পড়লে—

আগে তুই কান মল্‌।

শীতেশ দুই কানে হাত দিলো। নীপা নত মুখে হাসি চাপতে পারলো না। নীতিশ আর সরস্বতী আবার চোখাচোখি করলো।

শীতেশের মুখে আস্তে আস্তে হাসি ফুটলো। সেই হাসি সরস্বতীর মুখেও আস্তে আস্তে সঞ্চারিত হলো। দুজনেই আস্তে আস্তে একটু ঘাড় নাড়লো।

নীপা বললো, আমি যাই, বাড়িতে ভাববে, বকবে। বলে নীতিশ আর সরস্বতীর দিকে তাকালো। আড়চোখে একবার শীতেশকে। ফিরতে উদ্যত হলো।

নীতিশ ডেকে উঠলো, আচ্ছা, হ্যাঁ, বাড়িটা যেন কোথায়?

শীতেশ বলে উঠলো, ওই তো, ওই জানালা দিয়ে দেখা যায়।

নীতিশ খেঁকিয়ে বললো, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আচ্ছা, হ্যাঁ তোমার—হ্যাঁ তুমি করেই বলছি, তোমার বাবার নামটা জানতে পারি?

নীপা বললো, চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি কখন বাড়ি থাকেন?

সকালে আর বিকালে। দুপুরে স্কুলে থাকেন।

সরস্বতী এগিয়ে এসে নীপার কাঁধে হাত রেখে বললো, কাল সকালে এখানে একবার এসো।

নীপা বললো, সকালে যে আমার কলেজ আছে?

নীতিশ জিজ্ঞেস করলো, কী পড় তুমি?

নীপা বললো, ইংরেজি অনার্স।

এটা কোন্ ইয়ার?

ফাইন্যাল।

ভেরি গুড।

সরস্বতী বললো, কাল বিকেলে আর বাইরে কোথাও দেখা করতে যেও না। বিকেলে আমাদের বাড়িতেই এসো, কেমন?

নীপা লজ্জিত হেসে, মুখটা নামিয়ে নিলো। বললো, আপনি কাল আমাদের বাড়ি আসবেন। বলেই প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

নীতিশ আর সরস্বতী শীতেশের মুখোমুখি দাঁড়ালো। শীতেশ হাসবে কি হাসবে না, বুঝতে পারছে না।

সরস্বতী বললো, তুমি বটে ধুরন্ধর ছেলে! এরকম একটা মেয়েকে তুমি জপালে কী করে?

শীতেশ চোখ কপালে তুলে বললো, ওকে জপাবো আমি?

নীতিশ বললো, না, মেয়েটা তোর কাছে আপনিই এসেছিল।

মাইরি বলছি দাদা—।

চুপ! দাদাকে রেসপেক্ট করে কথা বলবি।

শীতেশ বৌদির দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার পিশতুতো বোনের